আবোল তাবোল-এর ইংরেজি অনুবাদ : একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা

সৌরভ দাশঠাকুর

ননসেন্স: অর্থমনর্থম্

ননসেন্সের দেশি বিলিতি বহু কবি লেখক সমালোচক ননসেন্স প্রসঙ্গে খেয়ালখুশি, খাপছাড়া, আবোলতাবোল, পাগলামি, আজগুবি, অসম্ভব ইত্যাদি শব্দ ও শব্দবন্ধ নিয়মিত ব্যবহার করলেও ''ননসেন্স'' (Nonsense) যে কোনোভাবেই অর্থহীন (nonsense) নয়, ''ননসেন্স'' এই আঙ্গিকগত (generic) নামটি যে নিতান্তই আলঙ্কারিক, সেকথা আজ প্রায় স্বতঃসিদ্ধ। এমনকি ননসেন্স রচনার মধ্যে বহু পাঠক আজ নানা রূপরসবর্ণগন্ধে সমাজের বহুরূপী ক্ষমতাকেন্দ্র ও প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ব্যঙ্গবিদ্রূপ, মৃদু কটাক্ষ থেকে শুরু করে তীব্র আক্রমণ পর্যন্ত নানা ধরনের প্রতিবাদ, প্রতিরোধ, প্রতিস্পর্ধার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উপস্থিতি লক্ষ্য করেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ এও মনে করেন যে ''ননসেন্স'' আঙ্গিকনামটি লেখকের ছদ্মনামের মতো এই সমাজ-বিরোধিতার একটি উৎকৃষ্ট কৌশলমাত্র, এক সচেতন প্রান্তিকতার চতুর আবরণ, যা ওই অনিশ্চিত নামের ধোঁয়াটে আড়াল তৈরি করে মেঘনাদের মেঘবর্মের মতো ক্ষমতাশালীর রক্তচক্ষু থেকে শিল্পীকে ও নিরন্তর প্রতিবাদের সম্ভাবনাকে বাঁচিয়ে রাখে। এই ধারণার ধারকদের কাছে ননসেন্সের আপাত-পাগলামি অনেকসময়ই একটি সদর্থক ভান, তার মধ্যে আছে এক অদ্ভুত বাঁধুনি, এক অন্তর্লীন method in madness, সাদাত হাসান মান্টোর ''টোবা টেক সিং'' বা রবীন্দ্রনাথের ''ক্ষুধিত পাষাণ'' গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্রদের ব্যবহার ও কার্যকলাপের মতো। এক কথায় বলা যায়, এই ইংরেজি শব্দটির দুই সম্ভাব্য লেখ্যরূপ — nonsense ও Nonsense — সমার্থক নয়। প্রথম রূপটি বিশেষণ, অর্থহীনতার দ্যোতক, আর দ্বিতীয় রূপটি নামবাচী বিশেষ্য, একটি বিশেষ সাহিত্য-আঙ্গিকের নাম। এই প্রবন্ধে আমরা প্রয়োজনে শব্দটির এই দুই ইংরেজি রূপ ব্যবহার করব, কারণ, বলা বাহুল্য, বাংলায় এই তাৎপর্যপূর্ণ বানানগত প্রভেদের অবকাশ নেই।

অন্য আর একদিক থেকে দেখলেও ননসেন্সের এই অর্থনির্ভরতার সমর্থন পাওয়া যায়। অর্থহীন কিছু অক্ষর বা শব্দসমষ্টি বিশেষ কিছু প্রেক্ষিতে কোনও কোনও সাহিত্যপ্রকরণে, যেমন শিশুসাহিত্য, লোকসাহিত্য, রূপকথা, ছড়া, ধাঁধা, বা পশ্চিমি আধুনিকতাবাদী, উত্তর-আধুনিকতাবাদী, অস্তিত্ববাদী বা অ্যাবসার্ডিস্ট সাহিত্য প্রভৃতিতে কৌশলগত কারণে উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হলেও তা স্বাধীনভাবে

কোনও সমগ্র রসোত্তীর্ণ শিল্পকর্ম সৃষ্টি করতে পারে না। স্রষ্টা ও ভোক্তার মধ্যে ন্যূনতম যোগাযোগের পথ খোলা না থাকলে শিল্পসৃষ্টির প্রাথমিক উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যায়। লেখক ও পাঠক দুজনেই অনিবার্যভাবেই স্ট্যানলি ফিশ যাকে ‘‘পাঠসম্প্রদায়’’ (interpretive community) বলেছিলেন তার অংশ।[১] সেখানে একটা স্তর পর্যন্ত পারস্পরিক বোঝাপড়া ও টানাপোড়েনের জটিল বহুমুখী বয়ন পাঠের পূর্বশর্ত। ননসেন্সের মধ্যেও এই বোঝাপড়া কিছুদূর পর্যন্ত কাজ করে। সুকুমার রায়ের ননসেন্সের অন্যতম প্রধান অনুবাদক সুকান্ত চৌধুরি তাঁর নিজের আবোল তাবোল অনুবাদ বিষয়ে (সম্ভবত সচেতনভাবেই) একটি আধাতরল মন্তব্য করেছিলেন, যে ননসেন্সের অনুবাদ খুব খারাপ হলেও ননসেন্সই (বাজে/ হাবিজাবি/ অর্থহীন প্রলাপ) হবে — “Clever men might debate whether nonsense can be translated; but I reassure myself that at worst, the result will still be nonsense.” মাইকেল হেম্যান আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছেন, এই মন্তব্যকে আক্ষরিক অর্থে নেওয়া মোটেই বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।[২] চৌধুরি যদি আমাদের যুক্তি অনুযায়ী ননসেন্সের দুই অর্থের কথা মাথায় রেখে উদ্ধৃতির প্রথম “nonsense”-টিকে “Nonsense” রূপে লিখতেন, তাহলেই তাঁর রসিকতাটিকে সহজভাবে উপভোগ করার পথে আমাদের কোনও বাধা থাকত না।

অবশ্য, ননসেন্সের অর্থের জগৎ আর পাঁচটা তথাকথিত ‘‘সেন্স’’ বা প্রথাগত অর্থে অর্থপূর্ণ সাহিত্য আঙ্গিকের পৃথিবী বা দৈনন্দিন সামাজিক যোগাযোগ কথাবার্তা বিনিময়ের পরিচিত জগতের থেকে অনেক আলাদা। ‘বাবু হাঁকেন, ‘‘ওরে আমার গোঁফ গিয়েছে চুরি’’’ শুনলে আমরা অর্থপূর্ণতা ও অর্থহীনতার মধ্যে টানাপোড়েনে চমকিত ও হতবুদ্ধি হই, কারণ বাবুর গোঁফ, বাবুর কোনও জিনিস চুরি যাওয়া, চুরির প্রতিক্রিয়ায় তাঁর অসহায় ক্রোধ বা বিলাপ ও হাঁক দিয়ে আশেপাশের চেনা মানুষজনের সে বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ ও পরোক্ষ সাহায্যপ্রার্থনা; এসবের কোনোকিছুই অচেনা বা অর্থহীন তো নয়ই, বরং আমাদের (অর্থাৎ ‘‘পাঠসম্প্রদায়ের’’) অতি সাধারণ অভিজ্ঞতাসম্ভারের অংশ। এই পর্যন্ত পংক্তিটির অর্থগত পরিমণ্ডল অ-সাধারণ কিছু নয় ও তা পাঠকের মধ্যে বিশেষ কোনও আগ্রহ বা কৌতূহল উদ্রেক করে না। সেটা করে, ও হঠাৎ আলোর ঝলকানির মতো পাঠকের মনের চোখ ধাঁধিয়ে তাঁকে মুহূর্তের মধ্যে পরিচিত অভিজ্ঞতাবৃত্ত থেকে একটানে উপড়ে ফেলে এক অভিনব, অত্যাশ্চর্য অর্থহীনতার জগতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বিস্মিত বিমূঢ় করে দেয়, একটি মাত্র উচ্চারণ — ‘‘গোঁফ গিয়েছে চুরি।’’ বস্তুত, গোটা ছড়াটিতে গোঁফের জায়গায় যদি অফিসের বড়বাবুর হরণযোগ্য অন্য কোনও বস্তু বসানো হয় — ঘড়ি কলম চাবি ওয়লেট টুপি চেকবই গাড়ি যা খুশি — তাহলে এক লহমায় ছড়াটি প্রাসঙ্গিকতা হারিয়ে ধ্বসে পড়ে ও মূলত অর্থহীন হয়ে যায়। অর্থাৎ ছড়াটির ভরকেন্দ্র কোনও সামগ্রিক উৎকেন্দ্রিক অর্থহীনতা নয়, বরং বিস্তৃত অর্থপূর্ণতার বহুমাত্রিক পরিমণ্ডলের মধ্যে একটিমাত্র মাত্রাকে সামান্য এদিক ওদিক করে দিয়ে শর্তসাপেক্ষ পাগলামির এক বিপ্রতীপ, বিকল্প জগৎ নির্মাণের মাধ্যমে অর্থের জগতে অনর্থ ঘটিয়ে দেওয়া। পাঠককে মজার ছলে মনে করিয়ে দেওয়া যে তাঁর আজীবন লালিত অর্থের জগৎ অজর অমর অক্ষয় অপরিবর্তনীয় কিছু নয়, বরং শুধু এক পলকা সংস্কার, থুরথুরে বুড়ির ঝুরঝুরে বাড়ির মতোই যাকে প্রতিনিয়ত থুতু দিয়ে চেটে আঠা দিয়ে সেঁটে সুতো দিয়ে বেঁধে কাঁটা দিয়ে এঁটে একরকম চলনসই করে রাখতে হয়, যাকে এক ফুৎকারেই নস্যাৎ করে দেওয়া কল্পনাশক্তিধর মানুষের বাঁ হাতের খেলা।

বহুপরিচিত এক দার্শনিক ধারার অনুসরণে একটু অন্যভাবে বলা যায় যে ভাষা, যা কোনও স্বতঃসিদ্ধ বাস্তবের সহজ উপস্থাপনার নিষ্ক্রিয় মাধ্যম নয়, বরং বাস্তবের সক্রিয় নির্মাতা, সেই মহাশক্তিমান ভাষার মধ্যে সুপ্ত অন্তহীন কার্যকারণসূত্র, ‘‘খেলা’’র সম্ভাবনা ও অসংখ্য বিকল্প ভাষ্যের বীজগুলিকে কিয়দংশে জাগিয়ে দিতে পারলেই অর্থের জগতে ঘটে যেতে পারে বিপ্লব, চেনা-অচেনার ওলটপালট

আলোআঁধারিতে অস্তিত্বের মূলে নেমে আসতে পারে সঙ্কট। মাইকেল হেম্যান এই সূত্রে বলছেন যে ননসেন্স হচ্ছে

> a particular kind of play, one that is not pure exuberance, not unrestrained joy and, above all, not gibberish (although all of these are often elements of it). Rather, it is an art form rooted in sophisticated aesthetics, linguistics and play with logic, and it is the art of nonsense that is one of its most appealing aspects.[৩]

একই কথা একটু অন্যভাবে মনে করিয়ে দিচ্ছেন প্রখ্যাত ননসেন্স-গবেষক উইম টিগ্‌স্‌, যাঁর মতে ননসেন্সের মধ্যে যুগপৎ জড়িত হয়ে থাকে "multiplicity of meaning" ও "absence of meaning."[৪]। টি এস এলিয়ট এই বিকল্প অর্থকে বর্ণনা করছেন ''অর্থের প্যারডি" ("parody of sense") বলে।[৫] অর্থ ও অর্থহীনতার অনিত্যতা ও অ-স্থির ভারসাম্যের স্বপনদোলায় দোদুল্যমান হয়ে এক উদ্দেশ্যহীন যাত্রায় কবির হাত ধরে বেরিয়ে পড়া ছাড়া পাঠকের এক্ষেত্রে আর কিছু করার থাকে না। পথ চলাতেই তাঁর আনন্দ, কোনও অর্থপূর্ণ লক্ষ্যে পৌঁছনো নয়, কারণ, এই বিকল্প জগতের নিয়মকানুন অ্যালিস বা হযবরল-র কথক বালকটির মতো পাঠসম্প্রদায়ের-ও অজানা। সে-জগতে গোঁফ যেমন চুরি যেতে পারে, রাজা তেমন প্রখর গ্রীষ্মে গনগনে ইঁটের পাঁজায় বসে না-গিলে বাদামভাজা খেতে পারেন। অ-পূর্ব এই কল্পবিশ্বে বিচরণের সময় চাঁদের উল্টোপিঠের চিরসত্য অথচ চির-অচেনা অন্ধকারাচ্ছন্ন বাস্তবের মতো আমাদের চেনা ভাষা চেনা যুক্তিশৃঙ্খলের অন্ধকার কন্দরে ঢাকা এইসমস্ত বিকল্প সম্ভাবনার দরজা হঠাৎ চোখের সামনে খুলে যায়। সত্যজিৎ রায়ের ভাষায়, ''এই উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গেই শব্দ ছন্দ ছবি সব মিলে এক আশ্চর্য নতুন অনুভূতি আমাদের সাধারণ কাব্য ও সাধারণ কৌতুকের জগৎ থেকে এক নতুন জগতে নিয়ে যায়। এরই সঙ্গে আমাদের কৌতূহলও জেগে ওঠে ঠিকই, কিন্তু পূর্ব প্রত্যাশার কোনো চেনা পথ দিয়ে কবির আগে এগিয়ে যাবার কোনো উপায় বা আগ্রহ থাকে না, কারণ আমরা বুঝতে পারি যে পথটা একমাত্র কবিরই চেনা পথ।"[৬]

ননসেন্স, বিকল্প বাস্তব ও "ফোক"

ননসেন্সের অর্থের জগতে অনর্থ নিয়ে যে সামান্য ক'টি কথা এতক্ষণ বলা হল, তা থেকে এটুকু বোঝা গেল যে আপাতদৃষ্টিতে ''ননসেন্স" আঙ্গিকটিকে হালকা হাসি বা মজা উদ্রেককারী বিনোদনমূলক শিশুতোষ সাহিত্য মনে হলেও এর সামাজিক রাজনৈতিক দার্শনিক ভাষাগত নান্দনিক তাৎপর্য অপরিসীম। ১৮৬০-৭০ নাগাদ ইংল্যান্ডে লিউইস ক্যারল, এডওয়ার্ড লিয়র প্রমুখের হাত ধরে আধুনিক ননসেন্সের উত্থান, বা বিশ শতকের প্রথমার্ধে বিলিতি ননসেন্সের অনুপ্রেরণায় সুকুমার রায় রবীন্দ্রনাথ যোগীন্দ্রনাথ সরকার গুরুসদয় দত্ত প্রমুখের হাতে বাংলায় — ও ভারতে — এই আঙ্গিকে ব্যাপক পরীক্ষানিরীক্ষা যে দুই সংস্কৃতিতেই নানা সামাজিক ও আত্মিক সংকটের সঙ্গে বোঝাপড়ার কালবেলায়, সেকথা নতুন করে উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। তবুও এই প্রসঙ্গের অবতারণা এইটুকু মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য যে, এই সময়ে পৃথিবীর দুই গোলার্ধেই জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে, জ্ঞান ও ক্ষমতার খেলায় লিপ্ত প্রাতিষ্ঠানিক পরিমণ্ডলে ও বিজ্ঞান-সাহিত্য-ইতিহাস-দর্শন-ধর্ম-কলা-সঙ্গীত ইত্যাদিসহ জ্ঞানচর্চার বিচিত্র শাখায় (discipline), যে বোঝাপড়া হচ্ছিল গুরুগম্ভীর নানা ভাষা ও প্রকরণের পরিব্যাপ্ত অনুশীলনের মাধ্যমে, সেই একই মৌলিক আত্মসন্ধান ও আত্মপরিচয় নির্মাণের প্রক্রিয়া ননসেন্সের জগতে জারি ছিল সমস্ত

গাম্ভীর্যময় চালকে দূরে সরিয়ে রেখে, প্রাত্যহিক ব্যবহারের ভাব ও ভাষায় হালকা হাসি, মজা আর কৌতুকের ওড়না উড়িয়ে। সাহিত্যের মধ্যেই, সমসাময়িক উপন্যাস, নাটক ও কাব্যে বিষয় ও শৈলীগত দিক থেকে অস্তিত্বসঙ্কট ও সমাজবাস্তবতার সঙ্গে বোঝাপড়ার স্বরূপ আর ননসেন্সের বিশ্বে তার প্রকৃতি সম্পূর্ণ আলাদা। মরাঠি ননসেন্স কবি মঙ্গেশ পদগাওকর এই কথাটিই বলছেন যখন তিনি দাবি করেন আদর্শ ননসেন্স হবে ''বৌদ্ধিক" (intellectual) নয়, ''অন্তর্দৃষ্টিমূলক" (intuitive) এবং ''অকৃত্রিম" (genuine)। পদগাওকরের মতে ননসেন্সের সঙ্গে পাঠকের যোগ অন্তরাত্মার অনায়াস যোগ, অস্তিত্বের মতোই সহজ : "We respond to nonsense with our 'being', that it exists without effort, without 'intellect', like a tree that simply 'is'."[৭]

কঠিন, গভীর কথাকে সহজিয়া মোড়কে উপস্থাপনের এই সংস্কৃতি অবশ্য নতুন কিছু নয়, সমস্ত দেশের লোকধর্ম, লোকসাহিত্য ও সাধারণভাবে লোকসংস্কৃতিতেই এর অজস্র উদাহরণ পাওয়া যাবে। ভারতেও ননসেন্সের ধারা এক মিশ্র ধারা : ইউরোপ ও অ্যামেরিকার ননসেন্স, কমিকস ও প্যান্টোমাইম-সহ আধুনিক নানা লোকসাংস্কৃতিক আঙ্গিক এবং নানাজাতের ছড়া, ধাঁধা, মিস্টিক ঐতিহ্যের ও ধর্মভাবাপন্ন নানা লৌকিক রচনা, ঘুমপাড়ানি গান প্রভৃতি বিচিত্র প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় দেশীয় লোকসাংস্কৃতিক উপাদানের মেলবন্ধনে এর সৃষ্টি, পোষণ ও ক্রমবিকাশ। অবশ্য এই প্রসঙ্গে বলা দরকার ননসেন্সের সহজিয়া ভাব কিন্তু মোটেই অনায়াসসাধ্য নয়, বরং বহু সাধনার ধন। অন্যভাবে দেখলে অবশ্য উল্টো কথাও বলা যায়, ননসেন্সের স্পিরিট, বা জিনিয়াস, যাঁর থাকে তাঁর সহজভাবেই থাকে, এ আর্ট পরিশ্রম করে অর্জন করা কঠিন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের ননসেন্সের ক্ষেত্রে তুলনামূলক অসাফল্য, এবং খাপছাড়ার মুখবন্ধ হিসেবে লেখা কৈফিয়ত-ছড়াটি এই বক্তব্যকেই সমর্থন করে : ''সহজ কথায় লিখতে আমায় কহ যে, / সহজ কথা যায় না লেখা সহজে। / লেখার কথা মাথায় যদি জোটে / তখন আমি লিখতে পারি হয়তো। / কঠিন লেখা নয়কো কঠিন মোটে, / যা-তা লেখা তেমন সহজ নয় তো।"[৮] অজিত কুমার দত্ত তো এও জানাচ্ছেন, রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেছিলেন, তিনি চেষ্টা করলে হয়তো বাকি সব কিছু হতে পারতেন, শুধু সুকুমার রায় নয়।[৯] অবশ্য সার্থক কাব্য ''তীব্র আবেগের সৎ ও স্বতঃস্ফূর্ত বহিঃপ্রকাশ" (spontaneous overflow of powerful feelings) — ইউরোপীয় রোম্যান্টিক আন্দোলনের, মূলত উইলিয়ম ওয়র্ডসওয়র্থের, সেই বহুলব্যবহৃত ও প্রায় বাতিল হয়ে যাওয়া কাব্যধারণার প্রতিধ্বনি করে পদগাওকর সহ ননসেন্সের সহজতার প্রবক্তারা যাই বলুন না কেন, সার্থক ননসেন্সে যে সহজাত প্রতিভার সঙ্গে পরিশ্রমসাধ্য কারুকলার (craft) মেলবন্ধন দরকার হয়, সুকুমার রায়ের ছড়ার বিবর্তনের ইতিহাস সেকথাই প্রমাণ করে। সন্দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত আবোল তাবোল-এর ছড়াগুলির প্রথম সংস্করণ (version) থেকে শুরু করে মৃত্যুশয্যায় শুয়ে কঠোর পরিশ্রমে কবির করা পরিবর্তন-পরিমার্জন সম্বলিত হয়েই যে তারা চূড়ান্ত রূপে আমাদের কাছে আসে, ''অত্যুক্তি ও আত্মনিষ্ঠা" প্রবন্ধে শঙ্খ ঘোষের মূল্যবান আলোচনা ছাড়া সেকথা হয়তো আমাদের অজানা থেকে যেত।[১০] নিজের কাজ সম্বন্ধে অবিশ্বাস্য খুঁতখুঁতে রবীন্দ্রনাথ যে অক্লান্ত পরিশ্রমে তাঁর প্রায় প্রতিটি কাজের একাধিক বা বহু সংস্করণ রেখে গেছেন, সেকথা কে না জানে। অন্যদিকে ''মজারু" ''শিশুসাহিত্যিক" সুকুমারের ''ননসেন্স"-এর পেছনে যে তুলনীয় সম্পাদনার ইতিহাস রয়ে গেছে, সেই সত্যের অপেক্ষাকৃত অবলোপ, বিশেষ করে ননসেন্সের ও সাধারণভাবে শিশুসাহিত্যের, কলা সম্পর্কে পাঠক ও সমালোচকদের ভ্রান্ত উন্নাসিকতা ও সাহিত্য আঙ্গিকের গুরুত্বের থাকবন্দী অনুক্রমে তাদের নিম্ন অবস্থানের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করে। এই ধারণার পরিবর্তনের সময় হয়েছে।

মনে রাখতে হবে, উনিশ-বিশ শতকের সন্ধিক্ষণ ইংল্যাণ্ড-ফ্রান্স-জার্মানিসহ ইউরোপের নানা দেশে

রোম্যান্টিক জাতীয়তাবাদের যুগ, যখন শহুরে মধ্যবিত্ত নিজ নিজ দেশের লোকসাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের মধ্যে জাতির মৌল ইতিহাস ও আত্মপরিচয়ের অভিজ্ঞান অনুসন্ধানে ব্যাপৃত ছিল। লোকশিল্প, লোকসাহিত্য, লোকসঙ্গীত ইত্যাদির ব্যাপক চর্চা শিক্ষিত নাগরিকসমাজে ''ফোক''-এর এক রোম্যান্টিক ধারণার প্রসারে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিল, বাস্তবের সঙ্গে যার সম্পর্ক অনেক সময়ই সন্দেহের ঊর্ধ্বে ছিল না। ভারতে, বিশেষত বাংলায়, এই সময়ে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ও সামগ্রিকভাবে জাতিগঠনের রাজনীতির নিয়ামক ছিল সংখ্যালঘু ইংরেজিশিক্ষিত নাগরিক মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক, যাদের ভাষা ও সংস্কৃতি ক্রমেই হয়ে উঠছিল সমগ্র ভারতীয় সংস্কৃতির ক্ষমতাকেন্দ্র। এই ক্ষমতাশালী জাতীয়তাবাদী বৃত্তের মধ্যের কিছু মানুষ, যেমন সমসাময়িক ব্রাহ্মদের মধ্যে কেউ কেউ, নির্মীয়মাণ নতুন ভারতে ভদ্রলোক-ছোটলোক-কেন্দ্রিক ক্ষমতার এই বিপজ্জনক নতুন বিভাজনের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। ঠাকুরপরিবারের উদ্যোগে আয়োজিত ১৮৬০-এর দশকের হিন্দুমেলা থেকে শুরু করে অক্ষয়কুমার দত্তের 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' (১৮৭১) হয়ে ১৮৮০-র দশকে কেশবচন্দ্র সেনের আধারোম্যান্টিক রামকৃষ্ণসঙ্গ ও ভক্তিমূলক বৈষ্ণব আন্দোলনে সম্পৃক্তি এই বিভাজনকে অতিক্রম করার ভদ্রলোক প্রচেষ্টার কিছু উদাহরণ। সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রান্তিক গ্রামীণ মানুষের মধ্যে বহুযুগ ধরে ক্রিয়াশীল বৈচিত্র্যময় ভারতীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের পুনরুদ্ধারের মাধ্যমে ইতিহাসসচেতন জাতিগঠনের এক বিকল্প ধারণার অন্যতম প্রথম ও প্রধান প্রস্তাবক রবীন্দ্রনাথ এই ধারারই নবতম ও সম্ভবত সর্বাধিক পরিচিত মুখ। ১৮৮০-র দশকের শেষদিক থেকে রবীন্দ্রনাথের নিজের বাঙালি লোকসংস্কৃতিতে বিশেষ আগ্রহের সূচনা ও বাঙালি ও ভারতীয় জাতিসত্তা গঠনে এদিক থেকে তাঁর মৌলিক ভাবাদর্শগত অবদানের বিষয়টি বহুচর্চিত।

যে সমমনস্ক মানুষেরা তাঁর এই আগ্রহ ও উৎসাহে প্রাণিত হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন সুকুমারের পিতা উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, যাঁর ছোটোদের জন্য লেখা অজস্র গল্প কবিতা ছড়া, রামায়ণ মহাভারতের শিশুপাঠ্য রূপ, পৌরাণিক কাহিনি ও রূপকথা-উপকথা এবং অবশ্যই তাদের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ অসংখ্য ছবিতে লোকসংস্কৃতিতে তাঁর গভীর অনুধ্যানের পরিচয় পাওয়া যায়। এই ব্রাহ্ম ও পারিবারিক ধারারই উত্তরসূরী সুকুমার, প্রান্তিক গণসংস্কৃতিতে যাঁর সহজ আগ্রহ ও সাবলীল অধিকার প্রকাশ পেয়েছিল তাঁর ছড়া-গল্প-নাটক-আঁকায় আধুনিক নাগরিক লোকসংস্কৃতির সঙ্গে বহুমাত্রিক যোগাযোগের রূপে। এদিক থেকে দেখলে সুকুমারের শিল্পকে আঠেরো-ঊনিশ শতকের কলকাতার নাগরিক গণপরিসরে কবি, পাঁচালি, খেউড় ইত্যাদি সহ পরবর্তীকালের ভদ্রসংস্কৃতিতে ব্রাত্য বাংলাভাষার অনালোকিত নিম্নপৃষ্ঠের (underside) শক্তির পরিচায়ক ও ''গণহাস্য'' (public laughter)-এর ঐতিহ্যবাহী গণসংস্কৃতির (popular culture) উত্তরাধিকারী হিসেবে দেখলে ভুল হবে মনে করি না। সুকুমারের ছড়া, গল্প, নাটক ও অন্যান্য রচনার আলোচনায় দেখা যাবে — যে কাজের সুযোগ এই প্রবন্ধের সংক্ষিপ্ত পরিসরে নেই — যে তাঁর শিল্প মূলগতভাবে ব্যক্তিপরিসরের নয়, গণপরিসরের শিল্প। মিখাইল বাখতিন ''গণহাস্য''-কে দেখেছিলেন ক্ষমতাসীনের বিরুদ্ধে প্রান্তিক জনগণের প্রতিবাদ-প্রতিরোধের সম্ভাবনায় ভরপুর এক শক্তিশালী অস্ত্র হিসেবে, যা তাঁর পাঠে প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতাতন্ত্রের বিপ্রতীপে এক বিকল্প সমান্তরাল সমাজভাবনার সূচক। বিভিন্ন ধরনের ''গণহাস্য'' তাই বাখতিনের কাছে কার্নিভালের রাজনৈতিক প্রকল্পের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ।[১১] সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, গৌতম ভদ্র প্রমুখ সমাজবিজ্ঞানীদের মূল্যবান কাজের সূত্রে আমরা নীতিবাগীশ, ক্ষমতাবান জাতীয়তাবাদী ভদ্রলোক সংস্কৃতিতে ক্রমে প্রান্তিক হয়ে যাওয়া এক নাগরিক গণসংস্কৃতিতে হাসি, উইট, ব্যঙ্গবিদ্রূপের মধ্যে দিয়ে ক্ষমতাসীনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ধারার সঙ্গে পরিচিত। অন্যদিকে, উনিশশতকের প্রথমার্ধ থেকে ব্রাহ্মসমাজের বাইরে কলকাতার বৃহত্তর ভদ্রসংস্কৃতিতে ঝকমকে উইটসম্বলিত হাসির যে রেওয়াজ ছিল, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত থেকে প্যারীচাঁদ হুতোম হয়ে বঙ্কিমচন্দ্র

পর্যন্ত যে ধারা প্রবাহিত, সুকুমারকে সেই ধারার বাইরে রেখেও দেখা যাবে না। এই শেষ ধারাটির সঙ্গে সুকুমারের যোগ বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে সত্যজিৎ রায়ের দেওয়া উদাহরণটিই ব্যবহার করি। ''আলালে দেখি — বেণীবাবু খান খাবু নাই গতি গঙ্গা / হুপ্‌হাপ্ গুপ্‌গাপ্ বেড়ে ওঠে দাঙ্গা। / বাবুরাম ধরে থাম 'থাম থাম' করে / ঠক ঠক ঠক ঠক কেঁপে মরে ডরে।" এই জিনিসই সুকুমারের হাতে পড়ে হল — ঠাস্ ঠাস্ দ্রুম দ্রাম শুনে লাগে খট্‌কা/ ফুল ফোটে? তাই বল! আমি ভাবি পট্‌কা। / শাঁই শাঁই পন্ পন্, ভয়ে কান বন্ধ / ওই বুঝি ছুটে যায় সে ফুলের গন্ধ?[১২]

প্রবন্ধের এই দ্বিতীয় অংশের আলোচনা থেকে আমাদের মূল অনুসিদ্ধান্ত দুটি। এক, ঔপনিবেশিক সংস্কৃতির অন্যতম মৌলিক প্রবণতা সঙ্করতার (hybridity) প্রেরণায়, কিছু পাশ্চাত্য উপাদানের মৌলিক ও গঠনমূলক আত্মীকরণ সত্ত্বেও, সাধারণভাবে বাংলা ননসেন্স ও বিশেষভাবে সুকুমারের ননসেন্সের শিকড় বাঙালির আঞ্চলিক সংস্কৃতির ইতিহাসের মাটিতে গভীরভাবে প্রোথিত। সাধারণভাবে যে কোনও দেশের ননসেন্স সম্বন্ধেই সম্ভবত বলা যায় যে মূলধারার সংস্কৃতিতে ব্রাত্য, প্রান্তিক লোকসংস্কৃতিই ননসেন্সের প্রধান প্রস্থানবিন্দু। ভাষার নানামাত্রিক বাচন ও নীরবতা ও তার আলোআঁধারির মধ্যে লুকিয়ে থাকা অনাবিষ্কৃত বহুস্তরীয় অজস্র সম্ভাবনার খেলা ননসেন্সের প্রধান উপাদান। আর ভাষা হল যে কোনও জনগোষ্ঠীর বস্তুগত, আত্মিক, আধ্যাত্মিক জীবনের সবচেয়ে সমৃদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য নিত্য পরিবর্তনশীল দলিল, চলমান অভিলেখাগার। তার মধ্যে সঞ্চিত থাকে কোন আদিকাল হতে বহমান দীর্ঘ ইতিহাসসঞ্জাত বিমিশ্র সামূহিক অভিজ্ঞতার পলিমাটি, যার বিস্তৃততম ও গভীরতম প্রকাশ লোকসংস্কৃতির (folk culture) ঐতিহ্য ও গণসংস্কৃতির (popular culture) পরিসর।[১৩] অথচ আধুনিক সংস্কৃতির ক্ষমতার রাজনীতিতে এই দুই ক্ষেত্রই প্রান্তিক। একটি জনগোষ্ঠীর গভীরতম ব্যক্তি ও গোষ্ঠীচেতনা, বিশ্ববোধ, জীবনদর্শন অনিবার্যভাবেই সেই জনগোষ্ঠীর ভাষার সংগঠন ও ব্যবহারিকতার যে মৌলিক কাঠামো তৈরি করে দেয় ও একইসঙ্গে সেই ভাষাকে তার বাহন করে, মূলগতভাবে ননসেন্সের কারবার সেই বোধ ও দর্শনের বিশ্ব নিয়েই। সেখানেই মঞ্জুস্থ হয় তার অর্থ-অনর্থের মধ্যে দোলাচলের নাটক। এই কারণেই মঙ্গেশ পদগাওকর ননসেন্সের মধ্যে খুঁজে পান এক মৌলিক প্রজ্ঞানির্ভর অন্তর্দৃষ্টি, আধুনিক যুক্তি ও বৌদ্ধিকতানির্ভর মনন যার তল খুঁজে পায় না। এই কঠোর মানদণ্ডের নিরিখে তিনি নিজের একটি ননসেন্স রচনাকেও রসোত্তীর্ণ মনে করেন না। অন্যদিকে, যে কোনও সংস্কৃতির এই মৌলিক ও গভীর প্রদেশটি এতটাই স্থানকালনির্দিষ্ট ও গোষ্ঠীর ''ব্যক্তিগত", যে অন্য কোনও সংস্কৃতির ইতিহাসের পথের সঞ্চয় অন্য ভাষায় তার সার্থক, সুখকর ভাষান্তর প্রায় অসম্ভব, অন্তত ভয়ানক কঠিন হতে বাধ্য। উমা রায় শ্রীনিবাসন তাঁর *আবোল তাবোল*-এর অনুবাদ সংক্রান্ত প্রবন্ধে এই সমস্যার দিকেই দৃষ্টি আকর্ষণ করেন : "Nonsense rhyme is born in and is nourished by the specific scope of an individual cultural lingual group. Consequently, the sense, or paradoxically, the non-sense, which goes to build a specific body of non-sense rhyme may in all likelihood generate no response in another alien set up."[১৪] একটি বিশেষ পাঠসম্প্রদায়ের — লেখক ও পাঠক দুজনই যার অংশ — ঐতিহাসিক চেতনা অন্য কোনও পাঠসম্প্রদায়ের মধ্যে একই অনুভূতি জাগাতে পারে না।

এই অংশে আমাদের দ্বিতীয় প্রতিপাদ্য, যেহেতু আর পাঁচটা সাহিত্য আঙ্গিকের তুলনায় নিবিড়তরভাবে ননসেন্স ভাষার জীবন, ইতিহাস, রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে থাকে — কারণ ভাষা এই সাহিত্যের শুধু মাধ্যমই নয়, বিষয়ও বটে — তাই ভাষার ইতিহাস ভূগোলের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর আত্মপরিচয় নির্মাণ সংক্রান্ত কিছু প্রশ্ন ননসেন্সের জগৎকে মৌলিকভাবে প্রভাবিত না করেই পারে না। দ্রুত পরিবর্তনশীল সমাজে — সে মধ্য-উনিশ শতকের ইউরোপ বা ইংল্যাণ্ড হোক বা আদি-বিংশ

শতকের ঔপনিবেশিক বাংলা বা ভারত — ভাষার মধ্যে ক্রিয়াশীল গোষ্ঠীগত স্মৃতি-বিস্মৃতি, প্রাচীন-আধুনিক, বিলুপ্ত-প্রাসঙ্গিক, নীরবতা-বাচকতা, অর্থপূর্ণ-অর্থহীন, বোধ্য-অবোধ্য, খাঁটি-ঝুটা, মূলের প্রতি আনুগত্য ও গঠনমূলক পরিবর্তনশীলতা প্রভৃতি দ্বৈতের অন্তর্গত দ্বন্দ্বের নিরসনের চ্যালেঞ্জটা ননসেন্সের মধ্য দিয়ে সমসাময়িক পাঠসম্প্রদায়কে নিতেই হয়। লিয়র-ক্যারল-সুকুমার-রবীন্দ্রনাথসহ সমস্ত ননসেন্স-শিল্পীর কাজের নিবিড় পাঠে এই বিচিত্র দ্বৈতের মধ্যে টানাপোড়েন দুর্লক্ষ্য নয়। আর অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই টানাপোড়েন কোনও সহজ ও নির্ভরযোগ্য সমাধানে পরিণতি পায় না, বরং পাঠককে এক আশা নিরাশার দ্বন্দ্বের দিকে ঠেলে দেয়। তাই ননসেন্সের ‘‘বাল্যরস” (রবীন্দ্রনাথ), ‘‘খেয়ালরস” (সুকুমার) বা মৃদুমধুর হাস্যরসের আবরণের অন্তরালে প্রায়ই বয়ে চলে শান্তরস ও করুণরসের ফল্গুধারা। “Modernism and the Nonsense Style” প্রবন্ধে জেমস্ রদার লিখছেন ঃ “Certainly it is a rare occasion when Nonsense as literary discipline ... impresses us as simply amusing, without serious aspects or consequences ... it is almost always a solemn business, maintaining the strictest of controls over both its influences and effects.”[১৫]। লিয়রের ছড়ার অন্তর্লীন নস্টালজিয়া আমাদের চোখ এড়ায় না, যেমন এড়ায় না এলিয়টের ছড়া, দুটি অ্যালিস উপন্যাস ও হযবরল-র অন্তিম বিষণ্ণতা, বা রবীন্দ্রনাথ, সুকুমার, যোগীন্দ্রনাথ প্রমুখের ছড়ার অদ্ভুত, উৎকেন্দ্রিক ও প্রায়ই সমাজবহির্ভূত — কখনও কখনও এমনকি সমাজপরিত্যক্ত — চরিত্রগুলির, বা পাগলা দাশু নন্দলাল ভবদুলালদের, একাকিত্ব, এবং তাদের জন্য লেখক ও পাঠকের কোমল অনুভব। এই ‘‘অন্য” (other)-রা তো শেষ বিচারে সত্ত্বার (self)-ই বিস্মৃত অথচ অবিচ্ছেদ্য অংশ, চাঁদের উল্টোপিঠের অন্ধকারের মতো।

সত্ত্বা ও অপরসত্ত্বার মধ্যে এই মৌলিক বিচ্ছেদের অনুভব রোম্যান্টিক কাব্যভাবনার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। লোকসংস্কৃতির সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ ননসেন্সের সঙ্গে রোম্যান্টিকতাবাদের আরেকটি সাযুজ্যের জায়গা। তবে করুণকোমল হাস্যরসের মোড়কে সেই অনুভবের প্রকাশের উদাহরণ অবশ্য রোম্যান্টিক সাহিত্যে খুব একটা দেখা যায় না। সেদিক থেকে দেখলে, বিশ শতকের প্রথম কয়েক দশকে ইউরোপীয় আধুনিকতাবাদী সাহিত্যে রোম্যান্টিক আর ক্ল্যাসিক প্রবণতার যে মেলবন্ধন দেখা গিয়েছিল, ননসেন্সের মধ্যে তার ছাপ খুঁজে পাওয়া সহজ। বাংলায় — এবং ভারতেও — একইসময়ে আধুনিক ননসেন্স চর্চার সূত্রপাত, এবং ইংরেজি আধুনিকতাবাদী সাহিত্যে যে দুজন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ননসেন্স চর্চা করেছিলেন, সেই আইরিশ জেমস জয়েস ও আমেরিকান টি এস এলিয়ট মূলধারার ব্রিটিশ সংস্কৃতিতে ছিলেন প্রান্তিক, ঠিক যেমন ছিলেন ঔপনিবেশিক সমাজবাস্তবে সুকুমার রবীন্দ্রনাথসহ অন্যান্য ভারতীয় ননসেন্স শিল্পীরা। এই সমাপতনের নান্দনিক-রাজনৈতিক তাৎপর্য বিশদ আলোচনার দাবি রাখে। সেই সুযোগ এখানে নেই।

ননসেন্সের অনুবাদ ও *আবোল তাবোল*

এতক্ষণের আলোচনায় ননসেন্সের যে বহুমাত্রিক বিপরীতধর্মিতার কথা বলা হল — যার মধ্যে আছে অর্থ ও অর্থহীনতা, ট্র্যাডিশনাল লোকসংস্কৃতি ও আধুনিক মধ্যবিত্ত সংস্কৃতি, গভীর সমাজমনস্কতা, আত্মপরিচয় নির্মাণ সংক্রান্ত দার্শনিকতা ও মননশীলতা এবং হালকা হাসি মজার মোড়কে তাদের উপস্থাপন, আর সবার উপরে ও পরিণতিতে কোমল হাস্যরস ও করুণরসের আশ্চর্য সহাবস্থান ইত্যাদি — তাকে, বলা বাহুল্য, অন্য ইতিহাস-সংস্কৃতির সৃষ্টি কোনও ভাষায় প্রতিস্থাপন বড়ো সহজ কাজ নয়। মূল

সাহিত্যিক ননসেন্স নিজেই সবসময় একাধারে এই সমস্ত বিপরীত প্রবণতার রসোত্তীর্ণ সার্থক সহাবস্থান ঘটিয়ে উঠতে পারে না বলেই তাকে প্রায় অবধারিতভাবেই অন্য এক কলার শরণাপন্ন হতে হয় — চিত্রকলা। বস্তুত, ননসেন্স যে কাব্যসঙ্গীত বা নাটকের মতোই মিশ্রকলা, কাব্যের সঙ্গে সুরের বা সাহিত্য-নৃত্য-গীতের মেলবন্ধনের মতোই সেখানে চিত্রকলার উপস্থিতি ঐচ্ছিক নয়, প্রায় বাধ্যতামূলক, একথা স্পষ্ট করে বলা দরকার।[১৬] কাব্যসঙ্গীতে কাব্যের অধিকার যেখানে শেষ, সেখানেই অনির্বচনীয়কে বোধে মূর্ত করে তোলার জন্য সুরের অধিকারের শুরু, রবীন্দ্রনাথের এই অনুভব ননসেন্সের রাজ্যে ছড়া ও ছবির যৌগশিল্পে সমান বৈধ বলে মনে করি। ননসেন্সে সাহিত্যের বাঙ্ময় ভাষা ও চিত্রকলার নির্বাক ভাষার এই প্রায়-বাধ্যতামূলক অর্ধনারীশ্বর সহাবস্থানের কারণেই সম্ভবত এমন কোনও প্রথম শ্রেণির ননসেন্স লেখক বা ছড়াকার পাওয়া যাবে না, যিনি দুই শিল্পেই দক্ষ নন। লিউইস ক্যারলের উপন্যাসগুলিতে আজ আমরা মূলত জন টেনিয়েলের চিত্রণে অভ্যস্ত হয়ে পড়লেও, এবং হেনরি হলিডে ও আর্থার ফ্রস্ট সহ আরও কেউ কেউ ক্যারলের সঙ্গে এই যুগলবন্দী করলেও, মনে রাখতে হবে, তাঁর ১৮৬২-র *Alice's Adventures Under Ground* নামের প্রথম অ্যালিস পাণ্ডুলিপির ৩৭টি ছবির সবগুলিই ক্যারলের নিজের আঁকা ছিল, পরে প্রকাশকের অনুরোধে তিনি টেনিয়েলের সাহায্য নেন। ননসেন্সের ভুলের ভবে যুক্তিশৃঙ্খলার সীমাবদ্ধতার অনুধাবনে ও তার অসম্ভবের ছন্দে ছন্দ মেলাতে যেমন দরকার এক প্রগাঢ় বিজ্ঞানমনস্কতা, তেমনি প্রয়োজন এই যুগ্মশিল্পে দখল। প্রথমেই বলে নিতে হবে, *আবোল তাবোল*-এর যে অনুবাদগুলি নিয়ে আমরা সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব, সত্যজিৎ রায় ছাড়া তাদের কারুরই অনুবাদক এই প্রাথমিক শর্ত পূরণ করেন না। এঁদের কেউ কেউ আবোল তাবোল-এর ছড়াগুলিতে সঙ্গের ছবিগুলিকে নিতান্তই আক্ষরিক অর্থে অলঙ্করণ, অর্থাৎ অনপরিহার্য সৌন্দর্যবর্ধনকারী উপরি পাওনা হিসেবে দেখেছেন, এবং সে কারণে হয় অনুবাদে সেগুলিকে এড়িয়ে গেছেন বা ছেলেমানুষি কিছু স্কেচ দিয়ে তাদের অঙ্গহানি করেছেন। অন্যরা — সত্যজিৎ রায় সহ — ইংরেজিতে অনূদিত ছড়ার ভাষ্যের সঙ্গে সুকুমারের বাংলা মূলের ছবিগুলি ব্যবহার করেছেন। এ বিষয়ে আমরা পরেও কিছু আলোচনা করব।

যে কোনও কবিতার অনুবাদেই মিল, ছন্দ, মিটার ইত্যাদির দাবি মিটিয়ে কাব্যের সার্থক ভাষান্তর অত্যন্ত কঠিন কাজ। ছড়াতে দৈনন্দিন মৌখিক ব্যবহারের শব্দের — অনেক সময়ই যারা লিখিত সাহিত্যের ভাষার অভিজাত অন্দরমহলে ঠাঁই পায়নি — আধিক্য, সহজিয়া মোড়কে গভীরতার চর্চা ও ছড়ার মূল বিশেষভাবে আঞ্চলিক সাংস্কৃতিক ইতিহাসে প্রোথিত থাকার কারণে ছড়ার অনুবাদকের কাজ আলাদা মুনশিয়ানার দাবি রাখে। ননসেন্স যে মূলত ছড়া, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ইংরেজিতেও ‘‘ননসেন্স’’ শব্দটির সঙ্গে সাধারণত poetry নয়, verse বা rhyme-ই ব্যবহৃত হয়। আর ননসেন্সে শব্দ — word আর sound দুই অর্থেই, যেমন পান (pun), অনোম্যাটোপিয়া, বাগ্‌ধারার আক্ষরিক অর্থে প্রয়োগ ইত্যাদি — ও ভাষার অন্তর্জগৎ নিয়ে খেলা এক অন্য মাত্রা নেয় বলে এক্ষেত্রে কাজটা কত কঠিন তা সহজেই অনুমেয়। তার ওপরে হাসির আবরণের অভ্যন্তরে করুণরস সৃষ্টির যে চূড়ান্ত দাবি, তা তো আছেই। যেখানে ভিন্ন সংস্কৃতির ভিন্ন ইতিহাসের অনুবাদের ভাষার আকার প্রকার চলন বলন অন্তর বাহির কিছুই মূল ভাষার সঙ্গে কোনোভাবেই সম্পর্কিত নয় — মনে রাখতে হবে আমরা একই ভাষা-পরিবারের, অর্থাৎ সংস্কৃত-বাংলা-হিন্দি-ওড়িয়া-অহমিয়া জাতীয় অনুরূপ বা সমান্তরাল বস্তুগত-সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক ইতিহাস বা বিবর্তনের দুটি ভাষার মধ্যে আদানপ্রদানের কথা আলোচনা করছি না, বলছি বাংলা ও ইংরেজির মতো দুটি সম্পূর্ণ পৃথক ইতিহাসের সৃষ্ট ভাষার কথা — সেখানে একথা মোটেই আশ্চর্যের নয় যে বাংলা কাব্যসাহিত্যে সম্পূর্ণ একটি মৌলিক ধারার অসম্ভব

সার্থক প্রবর্তন ও তার অনুসারী বিপুল পাঠক সমাদরের ইতিহাস থাকা সত্ত্বেও সুকুমারের মৃত্যুর প্রায় পঞ্চাশ বছর পরে ১৯৬৯-এ সত্যজিৎ রায়ের আগে সাহস করে কেউ তাঁর ননসেন্সের অনুবাদের কাজে হাতই দিতে পারেননি। তাও *আবোল তাবোল*-এর শিরোনামযুক্ত ৪৫টি ও অনামা ৭টি (যেগুলিকে সুকুমার সন্দেশ-এর পাতায় পাদপূরক হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন, এবং পরে গোটাগুটিভাবে ''ছিটেফোঁটা'' নাম দেন), মোট ৫২টি ছড়ার মধ্যে সত্যজিৎ মাত্র ১০টিরই অনুবাদ করেছেন। পাশ্চাত্যেও ননসেন্সের অনুবাদের ইতিহাস খুব বেশিদিনের নয়। এই প্রসঙ্গে মাইকেল হেম্যান লিখছেন :

> In the West, translations of nonsense literature have also been "far and few, far and few," so much so that Langford Reed, in the introduction to his 1926 anthology of nonsense verse, outrageously concluded that "Nonsense versification is [...] essentially a British and American art" (18). Only in more recent times, particularly with Hugh Haughton's anthology, *The Chatto Book of Nonsense Poetry* (1988), my own *The Tenth Rasa : An Anthology of Indian Nonsense* (2007), and John Agard and Grace Nichols' *Pumpkin Grumpkin : Nonsense Poems From Around the World* (2012), have significant strides been stridden towards English translation of nonsense literature — not without peril, but also not without moments, dare I say, of the nonsense nonpareil.[১৭]

ননসেন্স অনুবাদের বিশেষ কাঠিন্যের কথা মাথায় রাখলে মানতেই হবে, আর পাঁচরকম টেক্সট অনুবাদের ক্ষেত্রে অনুবাদকের যে ন্যূনতম স্বাধীনতা প্রাপ্য, ননসেন্সের ক্ষেত্রে তার থেকে কিছুটা বেশিই না পেলে অনুবাদ নেহাত নীরস কেজো হয়ে দাঁড়ায়। এবং এক অসম্ভব কঠিন কাজে পথিকৃৎ হিসেবে সত্যজিৎ এই স্বাধীনতার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছেন। পরবর্তী আবোল তাবোল অনুবাদকরা যদি অনুবাদ করে থাকেন, সত্যজিতের ১০টি ছড়ার অনুবাদের মধ্যে অধিকাংশকে অনুবাদ (translation) না বলে অনুপ্রাণিত সৃষ্টি (transcreation) বা ''স্বাঙ্গীকরণ'' (adaptation) বললেও হয়তো অত্যুক্তি হবে না, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের *'পথের পাঁচালি'* থেকে তাঁর নিজের *পথের পাঁচালির* রূপান্তরণের মতো। কমবেশি সব অনুবাদই তাই, তবে সত্যজিতের অনুবাদ রবীন্দ্রনাথের বাংলা গীতাঞ্জলি বা তাঁর নিজের অন্য নানা কাজের ইংরেজি ''তরজমা''র কথা মনে করিয়ে দেবে, যেখানে অনুবাদকের মূলানুগ হওয়ার বিশেষ দায় নেই, মূলের ভাবটুকু মোটামুটি অক্ষুণ্ণ রেখে মুক্ত ভাবানুবাদ / অনুপ্রাণিত সৃষ্টি (free transcreation) করলেই চলে। সম্ভাব্য অনেক উদাহরণের মধ্যে একটিমাত্র দেব। ''বোম্বাগড়ের রাজা''র মূলের কিছুটা ও সত্যজিতের সেই অংশের অনুবাদ পাশাপাশি দেখুন ঃ

বোম্বাগড়ের রাজা	**The King of Bombardia**
কেউ কি জান সদাই কেন বোম্বাগড়ের রাজা—	In the land of Bombardia
ছবির ফ্রেমে বাঁধিয়ে রাখে আমসত্ত্ব ভাজা?	The customs are peculiar:
রানীর মাথায় অষ্টপ্রহর কেন বালিশ বাঁধা?	
পাঁউরুটিতে পেরেক ঠোকে কেন রানীর দাদা?	The King, for instance, advocates
কেন সেথায় সর্দি হলে ডিগবাজি খায় লোকে?	Gilded frames for chocolates,
জোছ্না রাতে সবাই কেন আলতা মাখায় চোখে?	While the Queen—who goes to bed
ওস্তাদেরা লেপ মুড়ি দেয় কেন মাথায় ঘাড়ে?	With pillows strapped around her head—

টাকের 'পরে পণ্ডিতেরা ডাকের টিকিট মারে!
রাত্রে কেন ট্যাঁকঘড়িটা ডুবিয়ে রাখে ঘিয়ে?
কেন রাজার বিছ্না পাতে শিরীষ কাগজ দিয়ে?[১৮]

Insists her brothers specialise
In sticking nails in custard pies.

On moonlit nights the Bombardian—
His eyes all painted vermillion—
Keeps his silver pocket watch
Immersed in boiling butterscotch.
And if by chance he catches cold
He somersaults (if not too old).[১৯]

এখন, পাঠকমাত্রেই লক্ষ্য করবেন, মূলের ছন্দ, মিটার, পংক্তির দৈর্ঘ্য, স্তবক-প্যাটার্ন ইত্যাদি সূক্ষ্ম-স্থূল বিষয় বাদ দিলেও মূলের ভাবগুলিও অনুবাদে সবসময় যথাযথভাবে অনুসৃত হয়নি। কোনও কোনও ভাব অনুবাদে দীর্ঘায়িত হয়েছে, ভাবের ক্রম পাল্টে গেছে, কোনও কোনও পংক্তি বেমালুম অনুবাদে উবে গেছে। এক কথায়, এ প্রায় আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে করা সত্যজিতের নিজের সৃষ্টি। এখন, রবীন্দ্রনাথও তাঁর তরজমাতে অনেকটা তা-ই করতেন, তবে নিজের মূলের ক্ষেত্রে যতটা অন্যদের সৃষ্টির ক্ষেত্রে ততটা নয়। সত্যজিতের ক্ষেত্রে এ বিষয়ে কয়েকটি কথা মাথায় রাখা দরকার বলে মনে করি। এক, আগে বলা হয়েছে, তিনি শুধু সুকুমারের নন, সামগ্রিকভাবে বাংলা ননসেন্স অনুবাদের ইতিহাসে পথিকৃৎ। দুই, তিনি নিজে চলচ্চিত্র উপন্যাস ছোটোগল্প ছড়া ছবি সঙ্গীত ইত্যাদি মিলিয়ে এক বিচিত্রগামী বহুপ্রসবী শিল্পী, তাই তাঁর স্বাধীন স্বাঙ্গীকারী শিল্পীসত্তা, হয়তো কিছুটা অতিরিক্তভাবেই, তাঁর আবোল তাবোল অনুবাদে ছায়া ফেলেছে। আমার জানা অন্য কোনও সুকুমার-অনুবাদক সম্পর্কে একথা বলা যায় না। তিন, তাঁর পরের প্রথম প্রণিধানযোগ্য সুকুমার-অনুবাদকের — সুকান্ত চৌধুরী — কাজ (১৯৮৭) তাঁর সামনে আসার আগে ননসেন্সের সার্থক মূলানুগ অনুবাদের সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে তাঁর যে সন্দেহ ছিল, তাতে সন্দেহ নেই। চৌধুরির কাজের ভূমিকায় *হযবরল*-র অনুবাদ বিষয়ে তিনি যা বলছেন, সাধারণভাবে ননসেন্সের অনুবাদ সম্বন্ধে সেকথা তিনি বেশি বই কম প্রযোজ্য মনে করতেন মনে হয় না : "I had ... made the remark that it was impossible to imagine 'Ha-Ja-Ba-Ra-La' being translated into any other language ... Sukanta's very able and imaginative translation of this Carrollian fantasy is a refutation of my contention."[২০]। এই তৃতীয় কথাটি ননসেন্সের বিশেষ ভাষা-সংস্কৃতিগত বিশিষ্টতা ও সংশ্লিষ্ট সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে আমাদের আগের আলোচনাকেই সমর্থন করে। চার, তাঁর বাবার কাজ আইনত এক বিশেষ অর্থে তাঁর নিজেরই, অন্তত কপিরাইট ইত্যাদির ঝামেলা বা আইনগতভাবে অনুবাদকের স্বাধীনতার মুক্ত ব্যবহারের কৈফিয়ত দেওয়ার দায় নেই, এই ভাবনা হয়তো নিজের অজান্তেই তাঁকে প্রভাবিত করে থাকবে।

অবশ্য এই শেষ মন্তব্যটির বিরুদ্ধ যুক্তি দেওয়া যায় তাঁর ১৯৮৬ সালে প্রকাশিত এডওয়ার্ড লিয়রের ছড়া ও গদ্যের অনুবাদের সংকলন *তোড়ায় বাঁধা ঘোড়ার ডিম*-এর সংক্ষিপ্ত ভূমিকার স্বীকারোক্তি ও এই বইতে অনুবাদের ধরন থেকে। তাঁর *আবোল তাবোল* অনুবাদ বিষয়ে আমরা যা যা বলেছি, তার প্রায় সবই এই কাজের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। ভূমিকায় তিনি আত্মপক্ষ সমর্থন করছেন এইভাবে : "ননসেন্স রচনার আক্ষরিক অনুবাদ করতে গেলে অনেক সময়ই মূলের হাস্যরস বজায় থাকে না। তাই কয়েকটি অনুবাদের ক্ষেত্রে আমাকে অল্পাধিক স্বাধীনতা নিতে হয়েছে।"[২১] এখন, এই প্রবন্ধে আমাদের আলোচনার মূল বিষয় লিয়রের অনুবাদ নয়, তাই স্থানাভাবের কারণে আমরা লিয়রের মূল ও সত্যজিতের অনুবাদের তুলনামূলক আলোচনায় যাব না, তবে উৎসাহী পাঠক দুটি কাজকে পাশাপাশি রেখে দেখলেই বুঝবেন

অনুবাদকের নেওয়া ‘‘অল্পাধিক স্বাধীনতা’’-য় অল্পের থেকে অধিকের পরিমাণই বেশি। তবে আমাদের কাছে অনেক বেশি তাৎপর্যপূর্ণ এর পরের বাক্যটি, যেখানে ‘‘অল্পাধিক স্বাধীনতা’’র বিষয়েও আমাদের অবস্থানের সমর্থন মেলে : ‘‘লিয়রের লিমেরিকগুলিকে সরাসরি অনুবাদ না করে লিয়রেরই আঁকা ছবিগুলি অনুসরণ করে নতুন লিমেরিক রচনা করা হয়েছে।’’ সুকুমারের অনুবাদের ক্ষেত্রেও — অন্তত ‘‘বোম্বাগড়ের রাজা’’ ও আরও কিছু ক্ষেত্রে — কি তিনি মূলত তাই করছেন না? অনুবাদকের স্বাধীনতার ধারণাকে এই বাক্যের আলোতে আমরা কীভাবে ব্যাখ্যা করব, যেখানে অনুবাদক রাখঢাক না করে বলেই দিচ্ছেন, আসলে তিনি অনুবাদ করছেনই না, ‘‘নতুন লিমেরিক রচনা’’ করছেন? তাও আবার সেই নতুন অনুবাদ-রচনার মূল কি? না, ছড়াগুলি নয়, তাদের অপর অর্ধাঙ্গ ছবিগুলি।

এখানে আমাদের বক্তব্য দুটি। এক, ননসেন্স ছাড়া অন্য কোনও সাহিত্য আঙ্গিকের অনুবাদের ক্ষেত্রে কি অনুবাদক একই নীতি নিয়ে চলতেন? দুই, ননসেন্সে ও তার অনুবাদে ছবির গুরুত্ব, যা আমরা আগেই সংক্ষেপে আলোচনা করে মন্তব্য করেছি, বাগ্‌ভাষা ও চিত্রভাষায় সমান সৃষ্টিশীল দক্ষতার কারণে অনুবাদক হিসেবে সত্যজিৎ শুধু সুকুমারের অন্যান্য অনুবাদকের থেকে পৃথকই নন, তিনি ননসেন্স অনুবাদের সম্পূর্ণ অভিনব এক ধারণা উপস্থাপন করছেন, যেখানে স্পষ্টতই তাঁর পক্ষপাত আন্তঃসাংস্কৃতিক যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে সীমাবদ্ধ বাগ্‌ভাষার প্রতি নয়, তুলনায় অনেক বেশি সর্বজনীন চিত্রভাষার প্রতি। ননসেন্সের মতো মিশ্রশিল্পের অনুবাদের ক্ষেত্রে সেটাই আদর্শ অবস্থান কিনা সে বিষয়ে বিতর্ক হতেই পারে, তবে সুকুমারের অন্যান্য অনুবাদকদের ছবিকে প্রায় উপেক্ষা করে শুধুমাত্র ছড়ার অনুবাদও সার্থক কিনা সেই প্রশ্নও তোলার অবকাশ আছে, এবং এই দুই চরম অবস্থানের মধ্যবর্তী কোনও ভারসাম্যমূলক তৃতীয় অবস্থান থাকতে পারে কিনা তা-ও ভাবা দরকার। কাব্যসঙ্গীতের ক্ষেত্রেও কথা ও সুরের আপেক্ষিক গুরুত্বের সমস্যার সর্বজনগ্রাহ্য সমাধান আজও মেলেনি। “The Translator’s Invisibility” প্রবন্ধে অনুবাদতাত্ত্বিক লরেন্স বেনুটি অধিকাংশ পাঠক-সম্পাদক-সমালোচকের রক্ষণশীল ও অবাস্তব মতটিকে — যে আদর্শ অনুবাদ হবে মূলের ছায়েবানুগতা, আদর্শ অনুবাদক হবেন স্বচ্ছ আয়নার মতো যেখানে লেখকের অভিপ্রায় একদম স্পষ্ট, অবিকৃত ও উজ্জ্বল হয়ে প্রকাশ পাবে, অনুবাদক নিজের অস্তিত্বকে অবলুপ্ত করে দিয়ে হয়ে যাবেন অদৃশ্য — খুব একটা আমল দিচ্ছেন না : ‘the more “successful” the translation, the more invisible the translator, and the more visible the author or meaning of the original text.’[২২] বিশেষ করে ননসেন্সের অনুবাদে এই মত মানতে গেলেই বরং অনুবাদ ব্যর্থ হবে। তবে তার বিপরীত অবস্থান, যা তাঁর সুকুমার ও লিয়র অনুবাদে সত্যজিৎ মূলত নিচ্ছেন — অনুবাদকের সম্পূর্ণ স্বাধীনতার কারণে মূল লেখকের পশ্চাদ্‌ভূমিতে অপসারণ — তার গ্রহণযোগ্যতার বিষয়েও প্রশ্ন থেকেই যায়।

সত্যজিৎ সুকুমারের ইংরেজি অনুবাদ বিষয়ে প্রাথমিক দ্বিধা কাটিয়ে দেওয়ার পর ধীরে ধীরে বেশ কিছু সাহসী ও কল্পনাপ্রবণ অনুবাদক এ কাজে সফলতার সঙ্গে হাত দিয়েছেন। মজার ব্যাপার হল, সত্যজিতের পরেই যে একধাক্কায় এ বিষয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্ব কেটে গেল তা নয়। পরের অনুবাদক সুকান্ত চৌধুরীও *আবোল তাবোল*-এর ৩৯টি ছড়া অনুবাদ করে বাকিগুলি (৬টি শিরোনামযুক্ত ছড়া ও *ছিটেফোঁটা*) ও *হযবরল*-র কিছু অংশ বাদ দেওয়া শ্রেয় মনে করেছেন, এই যুক্তিতে যে সেগুলি “either relate to untranslatable points of Bengali idiom, or else appear to lose all their fun in translation — at least in my translation.”[২৩]। চৌধুরী (১৯৮৭) ও তাঁর পর আমার জানা সুকুমার-অনুবাদের বড়ো কাজ — সম্পূর্ণা চ্যাটার্জির *‘Wordygurdyboom!; The Nonsense World of Sukumar Ray’* (২০০৪); এর মধ্যে দীর্ঘ সময়ের ব্যবধান। চ্যাটার্জি *আবোল তাবোল* থেকে

অনুবাদ করেছেন শিরোনামযুক্ত ১৮টি ছড়া ও *ছিটেফোঁটা* থেকে অনামা আরও ৩টি, তবে তার পাশাপাশি তাঁর অনুবাদে *খাই খাই* ও *অন্যান্য কবিতা* ছাড়া *হযবরল*, *পাগলা দাশু ও অন্যান্য গল্প* থেকেও নির্বাচিত কিছু কাজ স্থান পেয়েছে। এর বাইরেও মাইকেল হেম্যান প্রমুখ সম্পাদিত ভারতীয় ননসেন্সের অনুবাদ-সংকলন *The Tenth Rasa*-র জন্য তিনি *আবোল তাবোল* থেকে আরও ৫টি ছড়া অনুবাদ করেছেন। অর্থাৎ *আবোল তাবোল* থেকে তাঁর অনুদিত মোট ছড়ার সংখ্যা ২৬। *আবোল তাবোল*-এর সম্পূর্ণ অনুবাদ হয়েছে আরও পরে, তবে প্রথম সেই কাজ করার কৃতিত্ব কার প্রাপ্য সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত নই। ছাপা আকারে শিরোনামযুক্ত ৪৫টি ও ‘‘ছিটেফোঁটা’’র অনামা ৭টি, মোট ৫২টি ছড়ার অনুবাদ প্রথম করেছেন নীলাদ্রি রায়, তাঁর *Rhymes of Whimsy : The Complete Abol Tabol By Sukumar Ray* (২০১৭) বইতে। তবে আন্তর্জালে আবোল তাবোল-এর আরও অন্তত একটি সম্পূর্ণ অনুবাদ পেয়েছি, ইফতে চৌধুরীর করা, নাম *Sukumar Roy : A Translation of Selected Works*, যেটি ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হয়েছে কিনা আমার জানা নেই। আন্তর্জালে লভ্য সংস্করণটিতে প্রচ্ছদপত্র ও অনুবাদকের একটি সংক্ষিপ্ত মুখবন্ধ ছাড়া অতিরিক্ত কোনও তথ্য না থাকায় কবে বইটি গণপরিসরে এসেছে তা বলা মুশকিল। এ ছাড়াও বিক্ষিপ্তভাবে কিছু অনুবাদ কেউ কেউ করেছেন, যেমন উমা শ্রীনিবাসনের যে প্রবন্ধটি আমরা আগে উল্লেখ করেছি তাতে শ্রীনিবাসন তাঁর যুক্তির সমর্থনে নিজেরই কিছু অনুবাদ ব্যবহার করেছেন, তবে এই প্রবন্ধের বাইরে তিনি *আবোল তাবোল*-এর আর কোনও স্বাধীন অনুবাদ করেছেন কিনা জানি না।

সুকুমারের ননসেন্সের ইংরেজিতে অনুবাদের উপরে উল্লিখিত পঞ্চাশ বছরেরও বেশি সময়ের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস থেকে এটুকু বোঝা যায় যে এ বিষয়ে অনুবাদকদের জড়তা ও দ্বিধা ধীরে ধীরে অনেকটাই কেটে গেলেও খুব বেশি মানুষ এখনও এই অ্যাডভেঞ্চারে যোগ দেওয়ার মতো সাহস সঞ্চয় করে উঠতে পারেননি। তবে পরিমাণগত অভাবের বিষয়টি অনেকটাই উপেক্ষা করা যেতে পারে উল্লিখিত কাজগুলির অধিকাংশের গুণগত মানের কথা ভেবে। আমরা এই ইতিহাসের একেবারে প্রথম যুগে সত্যজিৎ রায়ের করা ‘‘বোম্বাগড়ের রাজা’’র প্রথম দশ পংক্তির স্বাধীন অনুবাদ, বা ‘‘অনুপ্রাণিত সৃষ্টি,’’ বা ‘‘স্বাঙ্গীকরণ’’-এর কথা বলেছি। এবার রায়ের অনুবাদ এবং সুকান্ত চৌধুরী, নীলাদ্রি রায় ও ইফতে চৌধুরীর করা ওই দশ পংক্তি ও ছড়াটির শেষ দুই পংক্তির অনুবাদগুলি পাশাপাশি রেখে (সম্পূর্ণা চ্যাটার্জি এটি অনুবাদ করেননি) আমরা এদের একটি সংক্ষিপ্ত তুলনামূলক আলোচনা করব। বলা বাহুল্য, এই প্রবন্ধের সীমিত পরিসরে এঁদের সমগ্র কাজের যথাযথ বিশদ আলোচনা সম্ভব নয়। তবুও, আমার বিশ্বাস, নীচের উদ্ধৃতিগুলিকে তাঁদের কাজের যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য নমুনা হিসেবে দেখা যায়, এবং সেই নমুনাগুলির আলোচনায় তাঁদের অনুবাদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি, অনুবাদপদ্ধতি, অনুসৃত নীতি, এমনকি অনুবাদের সম্ভাব্য শক্তি ও দুর্বলতা সম্বন্ধেও কিছু আঁচ পাওয়া যেতে পারে।

সত্যজিৎ রায়
The King of Bombardia

In the land of Bombardia
The customs are peculiar:

The King, for instance, advocates
Gilded frames for chocolates,

সুকান্ত চৌধুরী
The Customs of Bombagarh

Have you heard of the monarch of
Bombagarh’s orders
To fry mango jelly and frame it with
borders?
And why does his queen wear a pouffe on

While the Queen—who goes to bed
With pillows strapped around her head—
Insists her brothers specialise
In sticking nails in custard pies.

On moonlit nights the Bombardian—
His eyes all painted vermillion—
Keeps his silver pocket watch
Immersed in boiling butterscotch.
And if by chance he catches cold
He somersaults (if not too old).
...
...
All of which, though mighty queer,
Is natural in Bombardia.

অলঙ্করণ : সুকুমার রায়

her head?
Or the queen's eldest brother knock nails
into bread?
There people turn cartwheels to cure their
catarrhs,
Rub rouge in their eyes by the light of the
stars,
Musicians walk muffled in blankets of state,
And bald-headed scholars stick stamps on
their pate.
But why should they pickle their watches in
whey?
Or line the king's mattress with sandpaper
grey?
...
...
Her brother goes waltzing, with hookas
adorned.
But what does it mean? Could we please be
informed?[২৪]

অলঙ্করণ : সুকুমার রায়

নীলাদ্রি রায়

King of Bombagarh

Know you why, the king of place,
Bombagarh name,
Fried mango-wafers, keeps tucked in a
photo frame?
To tie a pillow on her head why does queen
bother?
Nails hammer in loaves of bread her elder
brother?
Why folks there, as cold-remedy, turns-turtle
ply?
Moonlit night, red-rouge paint to their eyes
apply?
Experts, their heads and necks, cover up in
quilts?
Postage stamps, on bald pates, stick all
pundits?
Night-time, all pocket-watches, deep people
in lard?
The king makes his bed, why, on

ইফতে চৌধুরী

King of Bombagarh

The King of Bombagarh, does anyone really
know why
Hangs on the wall, dried and framed,
mango-pulp fry?
Why does the queen always strap a pillow
to her head?
Why does the queen-brother drive a nail
through bread?
Why do the people there flip when they
catch a cold?
Why do they paint the eyes at full moon,
young or old?
Why are the maestros wrapped up in
quilts that have clamps?
On their shiny bald heads, why do the
pundits stick stamps?
Why do they soak watches in butter,
very pure and melted?
Why do they spread coarse sand paper

sand-paper card?
...
...
King’s uncle—wreathed in smoke-pipes, dances he?
Why is all this happening? Can someone tell me?[২৫]

অলঙ্করণ : রাজার কোলে মন্ত্রীর অপেশাদার স্কেচ

right on the kingós bed?
...
...
Wearing a hookah-garland, why does the king’s uncle dance?
Does anyone have the answers? Are they all in a deep trance?[২৬]

অলঙ্করণ : ছেলেমানুষি লাইন ড্রইং

এখন, মূলের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে যে কেউ বুঝবেন, সত্যজিৎ সুকুমারের ভাবটুকু মোটামুটি অক্ষুণ্ণ রেখে নতুন ছড়া লিখছেন। মূলের তাল, লয়, ছন্দ, পংক্তি-দৈর্ঘ্য, মিটার কিছুই তাঁর অনুবাদে বজায় নেই। পংক্তিগুলির মধ্যে এক অদ্ভুত প্রশ্নের আবহ রচনা করে ও প্রতি পংক্তির শেষে তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে প্রশ্নবোধক বা বিস্ময়সূচক চিহ্ন ব্যবহার করে মূলে যে হতবুদ্ধি ও হতাশ বিস্ময়ের রস তৈরি করা হয়েছিল, অনুবাদে পূর্ণচ্ছেদ-অন্ত সাদামাটা কিছু বিবৃতিমূলক বাক্য সেই মজাকে প্রায় পুরোপুরি মাটি করেছে। ছড়ার — সুকুমারের ছড়ারও — সমস্ত রস ঘনীভূত হয়ে সাধারণত শেষ দুই পংক্তিতে ক্লাইম্যাক্সে পৌঁছোয় দুর্দান্ত পাঞ্চলাইনের ব্যবহারের মাধ্যমে। সত্যজিতের অনুবাদে তা-ও বদলে গিয়ে বাবুরাম সাপুড়ের সাপের মতো নখদন্তহীন নির্বিষ ঢোঁড়ায় পরিণত হয়েছে, যেখানে “queer”, “natural” প্রভৃতি মূল্যায়ক শব্দ ব্যবহার করে অনুবাদের মধ্যে queerness-এর রস তৈরি করতে পারার ব্যর্থতাই যেন অনুবাদক প্রকট করে দিয়েছেন। শিরোনামে মজার ‘‘বোম্বাগড়”-এর জায়গায় গম্ভীর “Bombardia”-র (ইংরেজি bombard শব্দের ভয়ানক অনুষঙ্গ উপেক্ষা করা অসম্ভব) ব্যবহার গোটা ছড়াটিতেই অনুসৃত শব্দচয়নের নীতির ইঙ্গিতবাহী। এই সবকিছু মিলিয়ে, অন্তত আমার পাঠে (প্রতি পাঠকের প্রতিক্রিয়া পৃথক হবে সেটাই স্বাভাবিক ও প্রত্যাশিত) মূল ছড়ায় হতবুদ্ধি বিস্ময়ের অন্তরালে ছড়াকারের বহুপঠিত হাসিখুশি, মজলিশি, রসিক মেজাজটিই যেন মূর্ত হয়ে ওঠে, আর অনুবাদে অনুবাদকের গম্ভীর, ব্যক্তিত্বপূর্ণ, আত্মমগ্ন পাবলিক সত্তা। সবার উপরে, সুকুমারের কাজ সম্পর্কে সত্যজিতের নিজেরই চূড়ান্ত মূল্যায়ন, এর মৌলিক বাঙালিত্ব, যাকে আমি এই প্রবন্ধে বোঝার চেষ্টা করেছি আধুনিক ছড়ার মধ্যে ছড়ার ঐতিহ্যে অন্তর্লীন আঞ্চলিক লোকসংস্কৃতির উত্তরাধিকার হিসেবে, অনুবাদে সেই বাঙালিত্বের ছিটেফোঁটা অবশিষ্ট নেই। এ অনূদিত ছড়া পুরোপুরি সাহেবি, যার চালচলন, মেজাজ সুকুমারের থেকে অনেক বেশি লিয়রের কাছাকাছি। এখন সেটা অনুবাদের শক্তি না দুর্বলতা সেটা নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করা যেতেই পারে, এখানে তার সুযোগ নেই। শুধু একটা কথাই বলব, অনুবাদকের উদ্দিষ্ট পাঠকসমাজ কোনটি এখানে সেই প্রশ্নও উঠে আসে। অর্থাৎ ইংরেজি জানা বাঙালি পাঠক, ইংরেজি জানা ভারতীয় পাঠক, নাকি বৃহত্তর আন্তর্জাতিক ইংরেজিভাষী পাঠক সমাজ, কাদের কথা মূলত মাথায় রেখে সত্যজিৎ এই অনুবাদ করেছিলেন, আলোচনায় সেটাও একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক। বলা বাহুল্য শুধু সত্যজিৎ নন, সব অনুবাদকের ক্ষেত্রেই একথা প্রযোজ্য।

পূর্বসূরীদের কাজ তাদের শক্তি ও দুর্বলতা নিয়েই উত্তরসূরীদের প্রভাবিত করে। এক ভয়ানক কঠিন কাজের জগতে পথিকৃৎ হিসেবে অনিবার্যভাবেই সত্যজিতের কাজে যে খামতিগুলি ঢুকে পড়েছিল, পাঠক অন্য তিনটি অনুবাদের দৃশ্যরূপ থেকেই খানিকটা বুঝছেন, যে ইতিহাসের উত্তরসূরী হিসেবে পরের অনুবাদকরা সেই দুর্বলতাগুলি অনেকটাই কাটিয়ে উঠেছেন। এই কাজগুলির ভেতরের নির্মিতি (architectonics) কাটাছেঁড়া করলেও অনুবাদের এই ধারাবাহিকতার ইতিহাসই উঠে আসে। অর্থাৎ

মৌলিক শিল্পকর্মের ব্যক্তিশিল্পী যেমন সাধারণভাবে দেশ-কাল-সমাজের ইতিহাস, বিশেষভাবে শিল্পের সামগ্রিক ঐতিহ্য ও আরও নির্দিষ্টভাবে সেই বিশেষ শিল্পের ইতিহাসের (tradition) বাইরে বিচ্ছিন্ন একক হিসেবে কাজ করেন না, অবিমিশ্র স্বাধীন ব্যক্তিপ্রতিভার (individual talent) ধারণা যেমন অলীক,[২৭] অনুবাদশিল্পীও তেমনি অনুবাদের ইতিহাসের মধ্যেই কাজ করেন। সত্যজিতের অনুবাদের শিরোনাম মোটামুটি মূল শিরোনামের আক্ষরিক অনুবাদ, বোম্বাগড়বাসীদের অদ্ভুত সব অভ্যেস — যা ছড়াটির বিষয় — এই অনুবাদের দ্বিতীয় পংক্তিতে "custom" হয়ে ধরা পড়েছে, শেষ দ্বিপদীতেও তারই ছায়া। সুকান্ত চৌধুরীর অনুবাদে "custom" সরাসরি শিরোনামেই ঠাঁই করে নিয়েছে, যদিও সুকান্তের অনুবাদ সত্যজিতের তুলনায় ছড়ার বিষয়বস্তু ও গঠনশৈলী, সবদিক থেকেই অনেক বেশি মূলানুগ। অনুবাদকের স্বাধীনতা কি তিনি নেননি? নিশ্চয়ই নিয়েছেন, তবু মূলের প্রতি আনুগত্য ও সেই স্বাধীনতার ভারসাম্য সেভাবে বিঘ্নিত হয়নি। রাজা অর্থে king-এর জায়গায় "monarch", বালিশ অর্থে pillow-র জায়গায় "pouffe" শব্দের ব্যবহারসহ সুকান্তের অনুবাদের ভাষার চলন ধ্রুপদী হলেও স্মার্ট। তবে ছড়ার, বিশেষত সুকুমারের ছড়ার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য সাধারণ মানুষের প্রাত্যহিক জীবনে প্রচলিত সহজ, মৌখিক শব্দের লাগসই ব্যবহার। গোটা আবোল তাবোল-এ সংস্কৃতগন্ধী ভারি ধ্রুপদী শব্দ সুকুমার সম্ভবত সচেতনভাবেই পরিহার করে চলেছেন। অথচ সেই ভাষাতেও তাঁর আশ্চর্য দখলের অজস্র উদাহরণ তাঁর অন্যান্য নানা কাজে ছড়িয়ে আছে। মূলের স্পিরিট বজায় রেখেও সামান্য স্বাধীনতা নিয়ে তার আক্ষরিকতা থেকে সুকান্তর সচেতন সরণ ছড়ার রসাস্বাদনে ব্যাঘাত ঘটায় না। মোটামুটি গোটা অনুবাদটি সম্বন্ধেই একথা বলা চলে। শেষের দ্বিপদীতেও ''রাজার খুড়ো" হয়ে গেছেন "Her [রাজার পিসির, যাঁকে আগের পংক্তিতে কুমড়ো নিয়ে ক্রিকেট খেলতে দেখা গেছে] brother", অর্থাৎ মূলের অর্থ একই রেখেও অনুবাদক তাঁর মতো করে উপস্থাপনের স্বাধীনতা নিয়েছেন।

পরের দুই অনুবাদক, নীলাদ্রি রায় ও ইফতে চৌধুরী, সম্ভবত সচেতনভাবেই, আরও বেশি আক্ষরিক। ছড়াটির প্রথম দুই পংক্তি, ''কেউ কি জান সদাই কেন বোম্বাগড়ের রাজা–/ ছবির ফ্রেমে বাঁধিয়ে রাখে আমসত্ত্ব ভাজা?" সুকান্ত, নীলাদ্রি ও ইফতের অনুবাদে যথাক্রমে হয়েছে "Have you heard of the monarch of Bombagarh's orders / To fry mango jelly and frame it with borders?", "Know you why, the king of place, Bombagarh name, / Fried mango-wafers, keeps tucked in a photo frame?" ও "The King of Bombagarh, does anyone really know why / Hangs on the wall, dried and framed, mango-pulp fry?"। তাঁর যথাসাধ্য-আক্ষরিক অনুবাদনীতির স্বপক্ষে নীলাদ্রি তাঁর মুখবন্ধ ও ভূমিকায় যুক্তিও দিয়েছেন এই বলে, যে সার্থক অনুবাদের প্রধান উদ্দেশ্যই হল মূল রচনার কবির অভিপ্রায় যথাসাধ্য নিখুঁতভাবে পাঠকের দরবারে পেশ করা, অর্থাৎ কবি ও অন্য ভাষার পাঠকের মধ্যে বিশ্বস্ত সেতু হিসেবে কাজ করা।[২৮] আমরা আগেই বলেছি ''অদৃশ্য অনুবাদক"-এর এই প্রাচীন ধারণা কতটা বাস্তবসম্মত তা তর্কাতীত না হলেও এর কার্যকারিতা উপেক্ষা করার নয়। কিন্তু এই বিশেষ ক্ষেত্রে মূলানুগত্যের দাম অনুবাদককে দিতে হয়েছে আড়ষ্ট বাক্যগঠনের মূল্যে। প্রথম দুই পংক্তিসহ গোটা অনুবাদটিতেই বাক্যগুলি ব্যাকরণগতভাবে নির্ভুল হলেও বাক্যাংশগুলির বিপর্যস্ত ক্রম এক কৃত্রিম, চেষ্টাকৃত গঠনের আবহাওয়া তৈরি করে ছড়ার সহজ সাবলীল চলনকে ব্যাহত করেছে। অথচ অনর্গল, অনায়াস, মোলায়েম, মন্দমধুর চলন ছড়ার, বিশেষত সুকুমারের ছড়ার আবেদনের অন্যতম প্রধান উৎস। কবির ভাবগত অভিপ্রায়ের প্রতি অতি-অনুগত হতে গিয়ে, আমার মনে হয়েছে, এই ছড়াটিতে নীলাদ্রি তার মজার মেজাজের প্রতি সুবিচার করেননি। বলা বাহুল্য, এই মন্তব্য তাঁর কাজের সামগ্রিক মূল্যায়ন নয়, তার সুযোগ এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে নেই, আর তা করা আমার উদ্দেশ্যও নয়।

আর তাঁর সার্থক অনুবাদের অনেক উদাহরণ এই সংকলনেই রয়েছে।

এই ছড়াটিরই শেষ দুটি পংক্তির কথা বলা যেতে পারে : ''রাজার খুড়ো নাচেন কেন হুঁকোর মালা প'রে? / এমন কেন ঘট্‌ছে তা কেউ বলতে পার মোরে?" সুকান্তর অনুবাদ "Her brother goes waltzing, with hookas adorned. / But what does it mean? Could we please be informed?"-এর দ্বিতীয় পংক্তির প্রথম অংশ থেকে বাংলা-না-জানা পাঠকের মনে হতে পারে, বক্তার সঙ্কট বুঝি আগের পংক্তির খুড়োর অদ্ভুতবেশ নৃত্য নিয়ে। কিন্তু তা তো শুধু নয়, ''এমন কেন ঘটছে" গোটা ছড়াটিতে বর্ণিত সমস্ত ব্যাখ্যাতীত ঘটনা বিষয়েই — অর্থাৎ বোম্বাগড়ের সামগ্রিক ব্যাপারস্যাপার নিয়েই — বক্তার মরিয়া অসহায় ভাবের প্রকাশ, যে ভাবটি আমার পাঠে যথাযথভাবে ধরা পড়েছে নীলাদ্রির বেশি আক্ষরিক "Why is all this happening? Can someone tell me?"-তে। একটিমাত্র শব্দের ব্যবহারেই — "all" — এই গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনটি হয়েছে। আবার "Could we please be informed?"-এর শীতল কেজো দূরত্বের থেকে "Can someone tell me?"-র সহজ সাধারণ বাকভঙ্গি আশেপাশের চেনা মানুষের — যারা *আবোল তাবোল*-এর পরিচিত চরিত্র — হতবুদ্ধি অবস্থাকে অনেক সহজ ও নিরাভরণ রূপে পাঠকের কাছে পেশ ক'রে তার আবেদনকে বাড়িয়ে দেয়। ননসেন্সের হাসির অন্তরালের করুণরসটি আমাদের হৃদয়কে সহজেই স্পর্শ করে। ইফতের অনুবাদেও এই সহজিয়া ভাবটি পাই। পাঠকমাত্রেই মানবেন সুকান্তের "mango jelly" বা নীলাদ্রির "mango-wafers"-এর থেকে তাঁর "mango-pulp" আমসত্ত্বের অনেক বেশি কাছের। মূলভাষার সংস্কৃতির সাথে পরিচয়ের ঘনিষ্ঠতার মাত্রা ছড়ার অনুবাদকেও প্রভাবিত করে। একইভাবে সুকুমারের সংস্কৃতিতে ''ওস্তাদ"-এর অনুবাদে সুকান্তের "musicians" নীলাদ্রির "experts" বা ইফতের "maestros"-এর থেকে অনেক বেশি সুপ্রযুক্ত মনে হয়। মূল ছড়ায় বক্তার মরিয়া অসহায় ভাব বোঝাতে প্রায় প্রতিটি বাক্যে / প্রশ্নে / পংক্তিতে ''কেন"র পুনরাবৃত্তি চমৎকার ধরা পড়েছে ইফতের অনুবাদে। মূলের ছন্দ, মিটার, তাল ইত্যাদি রক্ষায় সত্যজিৎ ছাড়া অন্য তিন অনুবাদকই যথেষ্ট যত্নশীল।

তবে যে বিশেষ উপাদানটি, আমরা আগেই আলোচনা করেছি, ননসেন্সের রচনা বা অনুবাদের অপরিহার্য অঙ্গ, যা শব্দের আবেদনকে বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়, সেই ছবির ব্যবহারে উপরে সংক্ষেপে আলোচিত চারটি অনুবাদে বৈসাদৃশ্য চোখে পড়ে। সত্যজিৎ বা সুকান্ত, সম্ভবত সচেতনভাবেই, মূলকে এ বিষয়ে অতিক্রম করার বা এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেননি। এখানেই সার্থক ননসেন্স রচয়িতার কেরামতি, তাঁর শিল্প এতই বহুমাত্রিক যে অনুবাদকের পক্ষে তার সামগ্রিক প্রতিস্থাপন কখনোই সম্ভব নয়, অনুবাদেও তিনি বস্তুগতভাবেই থেকে যান, একদম অননূদিত মূলরূপেই। একে বাদ দিলে অনুবাদ অসম্পূর্ণ হয়ে পড়ে, ঠিক যেমনটি হয়েছে নীলাদ্রি বা ইফতের অনুবাদের ক্ষেত্রে। নীলাদ্রি তাঁর নিজের *আবোল তাবোল*-এর ছড়াগুলির সম্ভাব্য অন্তর্নিহিত সামাজিক রাজনৈতিক ভাষ্যবিষয়ক মূল্যবান কাজ আলোয় ঢাকা অন্ধকার-এর ভূমিকায় ''আবোল তাবোলের সুকুমার-অঙ্কিত চিত্রায়নের গুরুত্ব" শিরোনামে একটি সংক্ষিপ্ত অনুচ্ছেদে এ বিষয়ে আমাদের অবস্থানের সঙ্গে সহমত হয়েই মন্তব্যও করেছেন যে ''আবোল তাবোলের কবিতার অন্তর্নিহিত অর্থের বিশ্লেষণকর্মে নিমজ্জিত হতে হলে ধরে নিতে হবে যে সুকুমারের আঁকা ছবিগুলি ওঁর কবিতারই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।"[২৯] তারপরেও তিনি তাঁর নিজের অনুবাদে এই ''অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ"গুলিকে কেন ছেদ করলেন, বিশেষত যখন স্বাভাবিকভাবেই কপিরাইট-সংক্রান্ত কোনও সমস্যা নেই, তা আমার কাছে রহস্যবিশেষ। এই ভুল আরও একজন করেননি, তিনি সম্পূর্ণা চ্যাটার্জি। চ্যাটার্জিসহ যে পাঁচজন প্রধান *আবোল তাবোল* অনুবাদকের কাজ নিয়ে এখানে আমরা সংক্ষিপ্ত আলোচনা করছি, তাঁদের সবার কাজে যে সাধারণ কটি ছড়া স্থান পেয়েছে তাদের সংখ্যা মাত্র চার: ''রামগরুড়ের ছানা",

''কাতুকুতু বুড়ো'', ''কাঠবুড়ো'' ও ''খুড়োর কল''। এই চারটি সাধারণ আনুবাদে তাঁদের দেওয়া শিরোনাম এই :

	রামগরুড়ের ছানা	কাতুকুতু বুড়ো	কাঠবুড়ো	খুড়োর কল
সত্যজিৎ রায়	The Sons of Ramgaroo	Old Tickler	The Old Woodman	Uncle's Invention
সুকান্ত চৌধুরী	The Griffon's Grouse	Tickle-My-Ribs	The Old Man of the Woods	The Inventor
সম্পূর্ণা চ্যাটার্জি	The Billy Hawk Calf	Tickling Tom	Wise Old Woody	Uncle's Contraption
নীলাদ্রি রায়	The Ramgorur Kid	Tickling Old-Timer	Knotty Woodoo	The Contraption
ইফতে চৌধুরী	Grumpy Griffin's Predicament	A Ticklish Matter	Woody the Wood Taster	The Inventor

শিরোনামগুলি থেকে বুঝতে অসুবিধে হওয়ার কথা নয়, অন্য তিনটি ছড়ার অনুবাদে নামকরণ সহজে হয়ে গেলেও ''রামগরুড়ের ছানা'' এ ব্যাপারে সবাইকেই কিছু বেগ দিয়েছে, কারণ কাল্পনিক জীব রামগরুড়ের ইংরেজি নাম অভিধান অনুসরণ করে মেলা শক্ত। তাই এখানে সবাইকেই বেশ একটু মাথা খাটিয়ে মৌলিক উদ্ভাবনার আশ্রয় নিতে হয়েছে। সত্যজিৎ নতুন নামে মূলকেই সামান্য একটু বদলে নিয়েছেন, নীলাদ্রি সেই ঝামেলাতেও না গিয়ে সরাসরি মূল নামটিই ব্যবহার করেছেন। সুকান্ত ও সম্পূর্ণার মূলগতভাবে পশ্চিমী কল্পনাজগৎ — যা সত্যজিতেরও জগৎ, এবং যা এঁদের সবারই অনুবাদের ইডিয়মে স্পষ্ট — তাঁদের অনুপ্রাণিত করেছে যথাক্রমে পাশ্চাত্য মিথের মনস্টারগোত্রীয় সংকর জীব গ্রিফিন (griffin), গ্রিফন (griffon) বা গ্রাইফন (gryphon) ও পশ্চিমী উপকথার শিশুতোষ গোমড়ামুখো জানোয়ার বিলি গোট গ্রাফের (Billy Goat Gruff) অনুসরণে বিলি হক কাফের শরণাপন্ন হতে। ইফতের শিরোনাম তাঁর এ বিষয়ে সুকান্তকেই অনুসরণ করার ইঙ্গিতবাহী। এ তো গেল নামাবলীর পাঁচকাহন। এবার দেখব এই অনুবাদকরা মূল ছড়ার প্রথম ও শেষ দুই স্তবক (স্থান সংকুলানের জন্য এই নির্বাচন) কীভাবে অনুবাদ করছেন :

সুকুমার রায়
রামগরুড়ের ছানা

রামগরুড়ের ছানা হাসতে তাদের মানা,
হাসির কথা শুনলে বলে,
''হাস্‌ব না-না, না-না।''

সদাই মরে ত্রাসে— ঐ বুঝি কেউ হাসে!
এক চোখে তাই মিট্‌মিটিয়ে
তাকায় আশে পাশে

. . .

. . .

হাসতে হাসতে যারা হচ্ছে কেবল সারা
রামগরুড়ের লাগছে ব্যথা

সত্যজিৎ রায়
The Sons of Ramgaroo

To the sons of Ramgaroo Laughter is taboo.
A funny tale will make them wail :
'We're not amused, boo-hoo!'

They live in constant fear Of chuckles far and near
And start and bound at every sound
That brings a breath of cheer

. . .

. . .

Those of you who are jolly And feel to woe is folly
Must not refuse the Ramgaroos

বুঝছে নাকি তারা?

রামগরুড়ের বাসা   ধমক দিয়ে ঠাসা,
হাসির হাওয়া বন্ধ সেথায়
নিষেধ সেথায় হাসা।[৩০]

Their right to melancholy

The Ramgaroosian lair   Bereft of sun and air
Is doomed to be a monastery
Of permanent despair.[৩১]

সুকান্ত চৌধুরী

The Griffon's Grouse

The Griffonling from birth   Is indisposed to mirth
To laugh or grin   He counts a sin
And shudders,   'Not on earth.'

He's always in a jitter   Lest you should laugh or titter,
And peers around   At every sound
With visage grim and bitter

. . .
. . .

The folk whose constant diet   Is thoughtless merry riot,
How can they bear   To so impair
The Griffon's peace and quiet?

The Griffon's den lies hidden: There cheerful thoughts are chidden,
He lines the walls   With frowns and brawls
And laughter stands forbidden.[৩২]

সম্পূর্ণা চ্যাটার্জি

The Billy Hawk Calf

The Billy Hawk Calf   Is forbidden to laugh
Crack a joke and he says
'No way, not by half!'

Always in a niggle—   Did someone just giggle?
One eye open pitter-patter
It tries to spot a jiggle.

. . .
. . .

Those souls who willy nilly   Laugh themselves so silly
Don't they see how each guffaw
Hurts the poor old Billy?

Billy Hawk's nest   Has no room for jest
There laughter is not allowed
Not even as a guest.[৩৩]

নীলাদ্রি রায়

The *Ramgorur* Kid

The Ramgorur Kid   From laughing is forbid
Crack a joke, and he shakes his head,
"Nope, of laughter I am rid!"

Always lives in fear— Should someone laugh near
Peers, one eye open, in cautious lookout
Glances here and there.

. . .
. . .

Those who in laughter   Shake beam and rafter,
Don't they get that in pains *Ramgorur*
From here to hereafter?

Ramgorurós nest hidden   Where humour is bedridden
A place bereft of fun it is:
There laughter is forbidden.[৩৪]

ইফতে চৌধুরী

Grumpy Griffin's Predicament

For little grumpy griffin life is tough
Without any fun it's really very rough
Tell him a joke and he'll utter,
"There's no way Ióm going to laugh."

He lives very much in perpetual fear
With a laughter-phobia very severe
Looks around with a blinking eye
To see things those are far and near.

. . .
. . .

He asks those who are so intent
To laugh to their hearts' content
"Don't you realize how much pain?
It causes me each and every moment?"

The whole griffin household for sure
Is filled up with lots of yells and roar
Absolutely closed to the winds of mirth
Laughter is not allowed to enter its core.[৩৫]

একসঙ্গে একই ছড়ার এতগুলি সুন্দর অনুবাদ কমই দেখা যায়। কমবেশি অনুবাদকের স্বাধীনতা সবাই নিয়েছেন, তবে মূলের ছন্দ লয় স্তবক-প্যাটার্ন বজায় রেখেই মূলের হাস্যরস, অদ্ভুতরস ও শেষে করুণরসের পরিবেশ সৃষ্টিতেও প্রায় সবাই সফল হয়েছেন। এ বড়ো সহজ সাফল্য নয়। একমাত্র ইফতে চৌধুরীর অনুবাদেই মূলের ছন্দ ঠিকমতো রক্ষিত হয়নি। সত্যজিৎ, যিনি ‘‘বোম্বাগড়ের রাজা’’র অনুবাদে মূলের ভাবটুকু অনুসরণ করে ও সুকুমারের অলঙ্করণ অবলম্বনে প্রায় এক নতুন ছড়া লিখেছিলেন, যাতে মূলের অপূর্ব রস প্রায় মাটি হয়ে গেছিল, তিনিও আশ্চর্যজনকভাবে এখানে মূলানুগ অথচ সার্থক ও রসোত্তীর্ণ অনুবাদে অনেক সাবলীল ও আত্মবিশ্বাসী। দুটি অনুবাদের মধ্যে সময়ের ব্যবধান কত ছিল তা জানতে পারলে এ বিষয়ে আরও নির্দিষ্ট আলোচনা করা সম্ভব হবে। তবে এও বলা দরকার, ‘‘রামগরুড়ের লাগছে ব্যথা / বুঝছে নাকি তারা?’র অনুবাদ “must not refuse the Ramgaroos / Their right to melancholy” মূলের প্রায় মর্মান্তিক করুণরস সৃষ্টিতে ব্যর্থ হয়ে তাকে অনেক অগভীর হাস্যরসে রূপান্তরিত করেছে। ‘‘ধমক দিয়ে ঠাসা” রামগরুড়ের বাসাকে “monastery of permanent despair” বানানোও যুক্তিযুক্ত হয়েছে মনে হয় না, কারণ monastery মানেই ধমক দিয়ে ঠাসা “permanent despair”-এর অন্ধকূপ নয়। উল্টোদিকে, ছন্দের অপূর্ব প্রয়োগে এ অনুবাদ মূলকেও ছাড়িয়ে গেছে। কারণ মূলে প্রতিটি স্তবকের প্রথম পংক্তিতেই শুধু অভ্যন্তরীণ অন্ত্যমিলের ব্যবহার ছিল (রামগরুড়ের ছানা / হাসতে তাদের মানা, বা, সদাই মরে ত্রাসে / ঐ বুঝি কেউ হাসে ইত্যাদি), যেখানে সত্যজিৎ এই মিল তো পুনর্সৃষ্টি করেছেনই, সঙ্গে মূলের ছন্দকে এতটুকু ব্যাহত না করে প্রতি স্তবকের দ্বিতীয় পংক্তিতেও অভ্যন্তরীণ অন্ত্যমিলের আমদানি করেছেন। ‘‘হাসির কথা শুনলে বলে” হয়ে গেছে “A funny tale will make them wail,” বা ‘‘একচোখে তাই মিট্‌মিটিয়ে” “And start and bound at every sound” ইত্যাদি।

এই ছড়ায় সত্যজিতের অনুবাদ আরও একটি কারণে অনন্য : একমাত্র তিনিই মূলের কর্তৃপদের (রামগরুড়) বহুবচনটিকে (হাসতে তার নয়, তাদের মানা) ধরে রেখেছেন। বাকি সবাই সুকুমার-লিয়র-ক্যারল-রবীন্দ্রনাথসহ সর্বত্র ননসেন্সের যে চেনা ছক — অদ্ভুত, খাপছাড়া, খ্যাপাটে একক চরিত্রের চিত্রণ — সেই প্রথার অবচেতন অনুসরণে সম্ভবত নিজেদের অজান্তেই ছানাদের বাদ দিয়ে এক রামগরুড়ের কথা বলেছেন। সত্যজিতের প্রারম্ভিক “sons of ramgaroo”-র পাশাপাশি বাকিদের দেখুন : সুকান্ত বলেছেন “The Griffonling”-এর কথা, সম্পূর্ণা “The Billy Hawk Calf”-এর, নীলাদ্রি “The Ramgorur Kid”-এর এবং ইফতে “little grumpy griffin”-এর। আমরা আগে বলার চেষ্টা করেছি, কীভাবে অনুবাদকরাও শিল্পী হিসেবে একক না থেকে অবধারিতভাবেই এক অবিচ্ছিন্ন ধারার মধ্যে কাজ করেন, পূর্বসূরীদের কাজ সচেতন বা অবচেতনে উত্তরসূরীদের প্রভাবিত করে। এই ছড়ায় সত্যজিৎ যেমন ছন্দ ও মিলের ব্যবহারে মূলকেও ছাড়িয়ে গিয়ে অনুবাদে মৌলিক কবিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন, তেমনই করেছেন সুকান্ত। শেষ স্তবকে “monastery” ইত্যাদির কথায় সত্যজিতের কাজের বিষয়ে যে অনুযোগ আমরা করেছি সুকান্ত তারও সুযোগ রাখেননি, যদিও ‘‘রামগরুড়ের লাগছে ব্যথা / বুঝছে নাকি তারা?’’র অনুবাদ “How can they bear / To so impair / The Griffon’s peace and quiet?”-এ ‘‘ব্যথা’’র অনুষঙ্গটি তার করুণ গভীরতায় ধরা পড়েছে বলে মনে হয় না। আর সেটা না ধরা গেলে ছড়াটির অন্যতম শক্তি যে দ্বিমাত্রিকতা; রামগরুড়ের ছানাদের যুগপৎ হাসিতে বিরাগ ও বাসায় ধমকের আধিক্যে এক নিরানন্দ জীবনযাপনে বাধ্যতায় চাপা দীর্ঘশ্বাস — যা ছড়াটিতে একইসঙ্গে মজা, বিস্ময় ও বিষাদের মিশ্ররস তৈরি করে, সেটা কি অনেকটাই একমাত্রিক হয়ে পড়ে না? সম্পূর্ণা ছন্দের ব্যবহারে মূলকে ছাপিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেননি, তবে এই দুটি পংক্তির ভাষান্তরণে তাঁর আক্ষরিক

অনুবাদ "Don't they see how each guffaw / Hurts the poor old Billy?" বেশি রসোত্তীর্ণ বলে মনে হয়। নীলাদ্রি ও ইফতে দুজনেই ব্যথা অর্থে "pain" কথাটি ব্যবহার করেছেন, তবে রামগরুড়ের ছানাদের নানা আবেগ — ভয়, দ্বিধা, সঙ্কোচ, বেদনা ইত্যাদি — নীলাদ্রির কাজে অনেক বেশি সহানুভূতির সঙ্গে ধরা পড়েছে। তবে আগেও যে কথা বারবার বলেছি, ছড়া, ননসেন্স ছড়া, বিশেষত সুকুমারের ননসেন্স ছড়া, তাঁর অলঙ্করণ ছাড়া, বা অন্তত সমমানের অলঙ্করণ ছাড়া, মূলগতভাবে অসম্পূর্ণ। পরিপাটি ছবির সঙ্গত পেলে, যা প্রথম তিন অনুবাদকের কাজে আমরা পাই;শেষ দুজনের, বিশেষত নীলাদ্রির কাজে ছবিছড়ার যুগলবন্দীতে, অনুবাদের যৌগশিল্প আরও বেশি প্রাণবন্ত হয়ে উঠতে পারত বলে আমার বিশ্বাস।

বলা বাহুল্য, এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য ছিল *আবোল তাবোল*-এর আমার জানা পাঁচ শক্তিশালী ইংরেজি অনুবাদকের অসম্ভব কঠিন কাজের সমালোচনা নয়, যথাসাধ্য সম্যক আলোচনার মাধ্যমে এই অনুবাদের ধারাটিকে বুঝতে চেষ্টা করা। এও আশা করি পাঠক মানবেন, এঁদের প্রত্যেকের কাজের পুঙ্খানুপুঙ্খ সামগ্রিক তুলনাত্মক আলোচনা একটি প্রবন্ধের বিষয়বস্তু হতে পারে না। আমরা এই সংক্ষিপ্ত আলোচনার পরিসরে কোনও বৃহৎ সরল সিদ্ধান্তেও পৌঁছোতে চাই না। ননসেন্স যেহেতু শেষ বিচারে বৌদ্ধিক (intellectual)-এর থেকে বেশি অন্তর্দৃষ্টিমূলক (intuitive), কাটাছেঁড়ার স্তর পার হয়ে রসিক পাঠক নিজেদের অনুবাদপাঠের অভিজ্ঞতা থেকেই বুঝে নেবেন এঁদের কাজের গুরুত্ব। আমার শেষ বলার কথা শুধু এইটুকু, সত্যজিৎ থেকে সুকান্ত, সম্পূর্ণা হয়ে নীলাদ্রি ও ইফতেতে পৌঁছোতে পৌঁছোতে আমরা বুঝতে পারি, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ননসেন্সের অনুবাদের কাঠিন্যের এবং তার সঙ্গে অনুবাদকের স্বাধীনতার বিশেষ আবশ্যকতার বোধ ক্রমশ কমে এসেছে। কোথাও এই আত্মবিশ্বাস জন্ম নিচ্ছে, যথাসাধ্য মূলানুগ হয়ে ও অনুবাদযুদ্ধে অনুবাদকের স্বাধীনতারূপ শেষ অস্ত্রের ন্যূনতম বা পরিমিত ব্যবহার করেও ননসেন্সের সার্থক অনুবাদ সম্ভব। শুধুমাত্র অনূদিত ছড়ার সংখ্যার হিসেবও এই ক্রমবর্ধমান যৌথ আত্মবিশ্বাসের দিকেই ইঙ্গিত করে। চার আনা থেকে আট আনা হয়ে সেখানে *আবোল তাবোল*-এর অনুবাদজীবনের হিসাব, অন্তত পরিমাণের বিচারে, ক্রমে ষোলো আনাতেই পৌঁছে যায়। এও মনে রাখার কথা, যে সুকুমারের ননসেন্স শুধুমাত্র *আবোল তাবোল*-এ সীমাবদ্ধ নয়, *হযবরল*, *খাই খাই*, *অন্যান্য কবিতা* সহ নানা কাজে তা ছড়িয়ে রয়েছে। সত্যজিৎ শুরু করেছিলেন *আবোল তাবোল*-এর দশটি মাত্র ছড়া দিয়ে, সুকান্ত আরও অনেক ছড়ার সঙ্গে যোগ করলেন *হযবরল*-র একটা বড়ো অংশ। তারপর সম্পূর্ণা পরিধিটাকে আরও অনেক বাড়িয়ে উপর্যুক্ত সমস্ত সংকলনকেই, যদিও নির্বাচিতভাবে, অনুবাদের বৃত্তের মধ্যে নিয়ে এলেন। তারপর নীলাদ্রি ও ইফতে দুঃসাহসী হয়ে গোটা *আবোল তাবোল*-এর অনুবাদের দুঃসাধ্য কাজও করে ফেললেন। ননসেন্সের অনুবাদকের ''পাঠসম্প্রদায়" হিসেবে এ বড়ো সামান্য অর্জন নয়। এইভাবেই এগোতে এগোতে আমরা ইংরেজি অনুবাদে — ক্রমে অন্য ভাষাতেও — পেয়ে যাব সুকুমারের সমগ্র ননসেন্স শুধু নয়, রবীন্দ্রনাথ, যোগীন্দ্রনাথ, গুরুসদয় দত্ত, অন্নদাশঙ্করের ননসেন্স। ইংরেজিতেও লিয়র ক্যারল ছাড়াও ডগলাস অ্যাডামস্, এডওয়ার্ড গোরে, ড. সিউসসহ আরও অনেকের কাজ অধিকাংশ বাঙালি পাঠকের কাছে আজও অজানা। কাজ অনেক বাকি।

---

[১] "Interpretive community"-র ধারণার বিশদ আলোচনার জন্য দেখুন Stanley E. Fish, "Interpreting the *Variorum*," *Critical Inquiry*, Vol. 2, No. 3 (Spring, 1976) : 465-85.

[২] Sukanta Chaudhuri, Translator's Preface, Chaudhuri (trans.), *The Select Nonsense of Sukumar Ray* (New Delhi : OUP, 1997, rpt. 2003), পৃষ্ঠাসংখ্যা নেই। Michael Heyman, "The Perils and Nonpereils of Literary Nonsense Translation", https-//wordswithoutborders.org/read/article/2014-06/rhe-perils-and-nonpereils-of-literary-nonsense-translation/, পৃষ্ঠাসংখ্যা নেই।

[৩] Michael Heyman, "An Indian Nonsense Naissance", Michael Heyman, Sumanyu Satpathy and Anushka Ravishankar (eds.), *The Tenth Rasa : An Anthology of Indian Nonsense* (New Delhi : Penguin, 2007), pp. xx-xxi.

[৪] Wim Tiggs, *An Anatomy of Literary Nonsense* (Amsterdom : Editions Rodopi BV, 1988), p. 255.

[৫] T. S. Eliot, "The Music of Poetry", Frank Kermode (ed. & introd.) *Selected Prose of T. S. Eliot* (New York : Harcourt Brace, 1975), p. 107.

[৬] সত্যজিৎ রায়, (ভূমিকা), সুকুমার রায়, *সমগ্র শিশুসাহিত্য* (সত্যজিৎ রায় ও পার্থ বসু সম্পাদিত), (কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স, বাংলা ১৩৮৩, পুনর্মুদ্রণ বাংলা ১৩৯২), পৃষ্ঠাসংখ্যা নেই।

[৭] Michael Heyman, "An Indian Nonsense Naissance", p. xxiii.

[৮] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *খাপছাড়া, রবীন্দ্র রচনাবলী* (সুলভ সংস্করণ, কলকাতা : বিশ্বভারতী, বাংলা ১৩৯৩, পুনর্মুদ্রণ বাংলা ১৪১৭), একাদশ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫।

[৯] Ajit Kumar Dutt, "Humour in Bengali Literature" থেকে নির্বাচিত অংশ, Sukumar Ray, *Nonsense Rhymes* (trans. Satyajit Ray) (Writers Workshop, 2019), p. 5.

[১০] শঙ্খ ঘোষ, ''অত্যুক্তি ও আত্মনিষ্ঠা", পবিত্র সরকার (সম্পাদিত), *সুকুমার পরিক্রমা* (কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি), পৃষ্ঠা ১৫-২২।

[১১] কার্নিভাল, গণহাস্য ও প্রান্তিক মানুষের প্রতিবাদ বিষয়ে বাখতিনের চিন্তাশীল আলোচনার জন্য Michail Bakhtin, *Rabelais and His World*, trans. H. Iswolsky (Bloomington : Indiana University Press, 1984), বিশেষত বইটির Introduction ও "Rabelais and the History of Laughter" (পৃষ্ঠা ১-৫৯) শিরোনামের প্রথম অধ্যায়টি দেখুন।

[১২] সত্যজিৎ রায়, ''ভূমিকা", সুকুমার রায়, *সমগ্র শিশুসাহিত্য*, পৃষ্ঠাসংখ্যা নেই।

[১৩] ভাষার নির্মাণ ও বিনির্মাণের ইতিহাসে জনগোষ্ঠীর সামাজিক, রাজনৈতিক, বস্তুগত ও আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার তাৎপর্য বিষয়ে একটি অপূর্ব আলোচনার জন্য দেখুন Ngugi wa Thiong'O, *Decolonising the Mind : The Politics of Language in African Literature* (London : James Currey, 1986), বিশেষত বইটির প্রথম অধ্যায়, "The Language of African Literature" (পৃষ্ঠা ৪-৩৩)।

[১৪] Uma Ray Srinivasan, "The Art of Translation : On Translating *Sukumar Ray's Abol Tabol in English*", *Translation Today*, Vol. 14, Issue 2 : 81-105, p. 86.

[১৫] James Rother, "Modernism and the Nonsense Style", *Contemporary Literature*, Vol. 15, No. 2 (Spring, 1974) : 187-202, p. 187.

[১৬] মিশ্রকলা হিসেবে ননসেন্সে ছবির গুরুত্ব নিয়ে এখনও যথেষ্ট আলোচনা হয়নি। এ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনার জন্য দেখুন Michael Heyman, "The Decline and Rise of Literary Nonsense in the Twentieth Century" in Roderick McGills (ed.), *Children's Literature and the Fin de Siecle* (Westport, CT : Praeger, 2003), p. 18. পৌষালী ভাদুড়ির প্রবন্ধ "Fantastic Beasts and How to Sketch Them : The Fabulous Bestiary of Sukumar Ray", *South Asian Review*, Vol. 34, No. 1, 2013 : 11-38 এ বিষয়ে একটি মনোজ্ঞ কাজ।

[১৭] Michael Heyman, "The Perils and Nonpereils of Literary Nonsense Translation", পৃষ্ঠাসংখ্যা নেই।

[১৮] সুকুমার রায়, *সমগ্র শিশুসাহিত্য*, পৃষ্ঠা ৫।

[১৯] Sukumar Ray, *Nonsense Rhymes* (trans. Satyajit Ray), p. 10.

[২০] Satyajit Ray, Introduction, Sukanta Chaudhuri (trans.), *The Select Nonsense of Sukumar Ray*, পৃষ্ঠাসংখ্যা নেই।

[২১] সত্যজিৎ রায়, *তোড়ায় বাঁধা ঘোড়ার ডিম* (কলকাতা : আনন্দ, ১৯৮৬, পুনর্মুদ্রণ ২০০৮), পৃষ্ঠা ৯।

[২২] Lawrence Venuti, “The Translator’s Invisibility”, *Criticism* 28.2 (1986) : 179-212, p. 179.

[২৩] Sukanta Chaudhuri, Translator’s Preface, Chaudhuri (Strans.), *The Select Nonsense of Sukumar Ray*, পৃষ্ঠাসংখ্যা নেই।

[২৪] তদেব, পৃষ্ঠা ২২।

[২৫] Niladri Roy (trans.), *Rhymes of Whimsy : The Complete Abol Tabol By Sukumar Ray* (Campbell, California : Haton Cross Press, 2017), p. 23.

[২৬] Ifte Choudhury, *Sukumar Roy : A Translation of Selected Poems*, https-//people.tamu.edu/~i-choudhury/Abol%20tabol.pdf, p. 24.

[২৭] বিশেষ করে বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে উত্তরগঠনবাদী (Poststructuralist) তত্ত্বের উত্থানের পর আজ একথা স্বতঃসিদ্ধ ও ক্লিশে মনে হয়। তবে আগ্রহী পাঠক এই ধারণার অন্যতম প্রাথমিক প্রস্তাবনা হিসেবে টি এস এলিয়টের “Tradition and the Individual Talent” (১৯১৯) প্রবন্ধটি দেখতে পারেন।

[২৮] Niladri Roy (trans.), *Rhymes of Whimsy : The Complete Abol Tabol By Sukumar Ray*, pp. xiii, xv-xvi.

[২৯] নীলাদ্রি রায়, আলোয় ঢাকা অন্ধকার (কলকাতা : দে’জ পাবলিশিং, ২০২১), পৃষ্ঠা ১৯-২০।

[৩০] সুকুমার রায়, সমগ্র শিশুসাহিত্য, পৃষ্ঠা ৮।

[৩১] Sukumar Ray, *Nonsense Rhymes* (trans. Satyajit Ray), pp. 14-5.

[৩২] Sukanta Chaudhuri (trans.), *The Select Nonsense of Sukumar Ray*, pp. 30-1.

[৩৩] Sampurna Chattarji (trans.), *Wordygurdyboom! (Abol Tabol) : The Nonsense World of Sukumar Ray* (New Delhi : Puffin Books, 2008), pp. 36-38.

[৩৪] Niladri Roy (trans.), *Rhymes of Whimsy : The Complete* Abol Tabol *By Sukumar Ray*, p. 40.

[৩৫] Ifte Choudhury, *Sukumar Roy : A Translation of Selected Poems*, p. 32.

সৌরভ দাশঠাকুর : বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক। তাঁর গবেষণামূলক প্রবন্ধ ও অনুবাদ দেশ বিদেশের বিভিন্ন জার্নাল ও সাময়িকীতে প্রকাশিত হয়েছে।